পাঁচগাঁও গণহত্যা

তপন পালিত

১৯৭১
গণহত্যা ও নির্যাতন
আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ১৮

গ্রন্থমালা সম্পাদক
মুনতাসীর মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন সিদ্দিকী

প্রকাশকাল
চৈত্র ১৪২১/মার্চ ২০১৫

পাঁচগাঁও গণহত্যা [Panchgaon Genocide]

©
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
[1971 : Genocide-Torture Archive & Museum Trust]
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী
[Bangladesh History Congress]

প্রকাশক
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
৩৩৪ শের-এ-বাংলা রোড, ময়লাপোতা মোড়, খুলনা ৯১০০
itihassammilani.bd@gmail.com, archivemuseum1971@gmail.com
০১৮১৬২৮৮৬৭৪, ০১৭১৫৪৫৭৩৮২, ০১৭১১২১৭১১১

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ, ৬০/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থ নকশা ও প্রচ্ছদ
তারিক সুজাত

পরিবেশক
জার্নিম্যান বুকস্ ও সুবর্ণ

মূল্য : ১৫০ টাকা

ISBN : 978 984 91549 8 3

দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড প্রদত্ত অনুদানের
সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন। একের অধিক মানুষ হত্যাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে গণহত্যা হিসেবে। নির্যাতনের অন্তর্গত শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করা। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনো একটি দেশে এতো অল্প সময়ে এতো হত্যাও হয়নি। যদিও আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন কিন্তু মনে হয় সংখ্যাটি তারও বেশি হবে। গণহত্যা, বধ্যভূমি, নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু গুরুত্ব ততোটা এর ওপর দেয়া হয়নি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা হয়েছিল তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে এখনও সেই গণহত্যার কথা ফিরে আসে। যে কারণে ইউরোপে ফ্যাসীবাদ আর নাজিবাদ জায়গা করে নিতে পারেনি। আমাদের এখানে তা হয়নি দেখে গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন এবং হত্যাকারীদের সমাজ ও রাজনীতিতে এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশে সামরিকবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আবারও শেকড় গেড়েছে।

এ দেশে গণহত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ থেকেই মূলত এসব বাহিনীতে গেছে কর্মিরা। সুখের বিষয়, এসব মানবতা-বিরোধীদের বিচার শুরু হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে।

দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনকী নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে গড়ে ওঠেছে **'১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট'**। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ।

এরই আলোকে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি পুস্তিকা লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হবে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। প্রতিবেদনধর্মী হলেও পুরো কাজটি গবেষণামূলক। উল্লেখ্য, গণহত্যায় সব শহীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রতিটি গণহত্যায় যে কজনের নাম পাওয়া গেছে শুধু তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থে অনেক আলোকচিত্র/শিল্পীদের চিত্রকর্মের প্রতিলিপি ব্যবহার করা হয়েছে, যা নেয়া হয়েছে অন্তর্জাল ও বিভিন্ন বই থেকে। মুক্তিযুদ্ধের ছবি যেহেতু জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয় সে জন্য কখনও কেউ আপত্তি তোলেননি। শিল্পী ও আলোকচিত্রিদের ঋণ আমরা স্বীকার করছি।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমি স্থলে সরেজমিনে গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে, গণহত্যা সংশ্লিষ্টজনের সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে– সেই অশ্রু-শোণিতের দিনগুলিকে অন্তরে অনুভব করে তবেই প্রণয়ন করেছেন এই ভাষ্য। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সেই গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে– এ ভরসা আমরা করি।

বর্তমান পুস্তিকায় *পাঁচগাঁও গণহত্যায়* মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রামের গণহত্যা ও গণকবরের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক তপন পালিত। নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেও তিনি এ কাজে পাঁচগাঁও গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন। আমাদের এই প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে শুধু গৌরব নয়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধূর কাহিনী তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উঠে আসবে। এই বেদনা ও গৌরবের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শও তো তাই।

মুনতাসীর মামুন
গ্রন্থমালা সম্পাদক

ভূমিকা

সকল যুদ্ধেই মানুষ হত্যার শিকার হয়। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই সেই হত্যাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আধুনিককালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার ব্যাপকভাগে গণহত্যা শুরু করেন। এই গণহত্যাকে বলা হয়েছে 'এথনিক ক্লিনজিং'। এই কারণে যুদ্ধাপরাধের দায়ে নাৎসী নেতাদের বিচার হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। এরপর বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সবচেয়ে বড় গণহত্যা সংঘটিত হয়। এই গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে প্রায় ৩০ লক্ষের অধিক লোককে হত্যা এবং ৪ লক্ষের অধিক নারীকে ধর্ষণ করা হয়। গণহত্যার সমান্তরালে চলে অপহরণ ও নির্যাতনও। গণহত্যার পর লাশ রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। অনেক সময় হত্যার পর লাশ ভাসিয়ে দেয়া হয় নদীর পানিতে। অনেক ক্ষেত্রে একই কবরে একাধিক ব্যক্তিকে সমাহিত করা হয়। সেই রকম একটি গণকবর পাঁচগাঁও। অনেক সময় দেখা গেছে নির্দিষ্ট একটি স্থানকে বেছে নেয়া হয়েছে হত্যা করার জন্য, যা পরিচিত হয়েছে বধ্যভূমি হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ছাড়াও নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়েছে অসংখ্য নারীকে। ১৯৭১ সালের ৭ মে মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রামের গণহত্যা নিয়ে বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানি বাহিনী ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু করলে মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার প্রত্যন্ত পাঁচগাঁও গ্রামেও এর প্রভাব পড়ে। এই গ্রামটি উপজেলা শহর হতে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। হিন্দু প্রধান গ্রামটির মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস ছিল কৃষি। পাঁচগাঁও গ্রামের সাধারণ মানুষ দেশের রাজনীতির তেমন খবর রাখতো না। কৃষিকাজ নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকতো। কিন্তু তারপরও তাদেরকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঘৃণ্য গণহত্যার শিকারে পরিণত হতে হয়েছে ।

২৭ মার্চ থেকেই পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজনগর উপজেলায় প্রবেশ করতে শুরু করে। রাজনগরে তাদের অবস্থানের কারণে স্থানীয় কিছু রাজাকার সুবিধা লাভ করে। তারা শান্তি কমিটিতে নিজেদের নাম লেখায়। শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে তারা গ্রামে প্রভাব খাটাতে শুরু

করে। তাদের অত্যাচার সহ্য করেও গ্রামবাসী গ্রামে থেকে যায়। তখন হিন্দু সম্প্রদায়কে গ্রাম ছাড়া করার জন্য শুরু হয় ডাকাতি। ঘন ঘন ডাকাতির মাধ্যমে হিন্দু প্রধান গ্রামটিতে ভীতির সঞ্চার করা হয়। গ্রামের সাধারণ মানুষকে অভয় দিতে রাজনগর থানার ওসি মতিউর রহমান কয়েকবার গ্রামটি পরিদর্শন করেন। তার অভয় বাণীতে মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয় এবং তারা গ্রামে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্যদিকে শহর হতে অনেক মানুষ পাঁচগাঁও গ্রামে আশ্রয় নেন। কিন্তু এই গ্রামটি শেষ পর্যন্ত আর তাদের অভয়াশ্রম থাকেনি। গ্রামের কিছু কুচক্রী রাজাকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাকিস্তানি বাহিনীকে গ্রামে আমন্ত্রণ জানায়। ডাকাতির ভয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ পাহারার ব্যবস্থা করেছিলো। প্রতিটি পরিবারের একজন করে সদস্য প্রতি রাতে পাহারায় নিয়োজিত থাকতেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ১৯৭১ সালের ৭ মে রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজাকার আলাউদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আসে। গ্রামের সাধারণ মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ঠিক সেই সময়ে ভোর রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর ৫০-৬০ জন সদস্যের সাথে স্থানীয় রাজাকাররা গ্রাম ঘিরে ফেলে। এরপর শুরু হয় তাদের নারকীয় তাণ্ডব। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আগুন দেয়া হয়। ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে শান্তি কমিটির মিটিং আছে বলে হিরণ বাবুর বাড়ির দিঘির পাড়ে জড়ো করা হয়। জড়ো হওয়া শতাধিক গ্রামবাসীকে একজনের মাথার সাথে অন্যজনের পা বেঁধে লাথি মেরে পানিতে ফেলে দেয়া হয়। এরপর শুরু হয় নির্বিচারে গুলি। গ্রামবাসীর রক্তে দিঘির পানি লাল হয়ে যায়। অন্যদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী রাজাকাররা গ্রামে চালায় অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও লুটপাট। তাদের সাথে যোগ দেয় প্রতিবেশী গ্রামের কিছু মানুষ।

পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা থেকে কয়েকজন দৈবক্রমে বেঁচে যান। তাদের হত্যা করার জন্য পরবর্তীকালে কয়েকবার গ্রামে হামলা করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনী চলে যাবার পর আশে পাশের গ্রামের মানুষ এসে দিঘির পানিতে জাল ফেলে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে, যার মধ্যে একজন ছিলেন নারী। উদ্ধারকৃত মৃতদেহগুলো দিঘির পশ্চিম পাড়ের খালে গণকবরে সমাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাঁচগাঁওয়ের কয়েকশ লোককে হত্যা করা হয়। তাঁদের সকলের নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পাঁচগাঁও গণহত্যা ও গণকবরটির ইতিহাস যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে উঠে আসেনি। মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা ও গণকবর সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোতে এই গণহত্যা সম্পর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনা করা হয়নি। এমনকি শহীদের সংখ্যা নিয়েও বিভিন্ন বইতে ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ৭ মে পাঁচগাঁও গণহত্যায় কতজন শহীদ হয়েছিলেন তা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। সিলেট জেলার গণহত্যা নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাজুল মোহাম্মদের *সিলেটে গণহত্যা*, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে* এবং *সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মারক* অন্যতম। তিনি তাঁর গ্রন্থে পাঁচগাঁও গণহত্যা সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ নয়। *সিলেটে গণহত্যা* গ্রন্থে তিনি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে ৭ মে গণহত্যায় শহীদ হিসেবে ৫৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। *সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মারক*–এ তিনি ৭৩ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* (২য় খণ্ড)-এ এই গণহত্যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে শহীদের সংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে ৫৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে। ড. মুমিনুল হক *রাজনগরের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে রাজনগরের গণহত্যা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। তিনিও শহীদের সংখ্যা ৫৯ জন বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আশফাক হোসেন *মৌলভীবাজারের মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থেও একই সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। *দৈনিক মাতৃভূমি*-এর ১২ মে ২০০০ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম শতাধিক হলেও শহীদ হিসেবে উল্লেখ করা হয় ৫৯ জন। *দৈনিক মাতৃভূমি*-এর ২৫ মার্চ ২০০০ সালের প্রতিবেদনেও শহীদের সংখ্যা ৫৯ জন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সঞ্জয় কান্তি দেব তাঁর *বিস্মৃতির আড়ালে সিলেটের গণহত্যা* গ্রন্থে শহীদের সংখ্যা হিসেবে ৫৯ জন (কারো মতে ৭৩) বলে উল্লেখ করেন।

কিন্তু পাঁচগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৩ বছরপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকাতে শহীদের সংখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে ৬৯ জন। *দৈনিক যুগান্তর*-এর ২৮ মার্চ ২০০১ সালে প্রকাশিত 'মৌলভীবাজারে পাঁচগাঁও গণহত্যার নেতৃত্বে ছিল আলাউদ্দিন, আনা মিয়া, আব্দুল মতিন গং' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শহীদের সংখ্যা ৬৯ জন বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও *দৈনিক ইনকিলাব*-এর ২৭ মার্চ ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধে ৬৯ নিরীহ গ্রামবাসী হত্যা রাজনগরে আজও কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়নি' শীর্ষক প্রতিবেদনেও শহীদের সংখ্যা ৬৯ জন হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

সরেজমিনে পাঁচগাঁও গণহত্যা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন জনের নিকট থেকে বিভিন্ন তথ্য পাই। তবে কোনো তথ্যই শহীদের সংখ্যা একশোর কম নয়। ৭ মে শতাধিক লোককে দিঘির পাড়ে একত্র করা হলেও লাশ পাওয়া গিয়েছিল ৫৯ জনের। কারো কারো মতে ৬৯ জন থেকে ৭৩ জন পর্যন্ত। সকল তথ্য সংগ্রহ শেষে পাঁচগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে শহীদের সংখ্যা শতাধিক। তবে সকলের নাম, পরিচয়, বয়স জানা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যত জন শহীদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা এই বইয়ে উল্লেখ করে ছ। তবে মাঠ পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারি যে পাঁচগাঁও গ্রামে গণহত্যায় শহীদের সংখ্যা অনেক বেশি। কারণ এই গ্রামে শহর থেকে অনেক লোক এসেছিলেন। তাদের সম্পর্কে গ্রামবাসী কোনো তথ্য দিতে পারেননি। অনেককে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গাড়িতে করে নিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসেননি। তাই ৫৯ বা ৬৯ জনের সংখ্যার বিচারে না গিয়ে আমি পাঁচগাঁওয়ের যতজন শহীদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করেছি। প্রত্যক্ষদর্শী ও তথ্যের অভাব, সময়ের স্বল্পতা এবং আমার সীমাবদ্ধতার জন্য সকল শহীদের নাম ও পরিচয় তুলে ধরতে পারিনি– এ আমার ব্যর্থতা।

স্বাধীনতার ৪৪ বছর অতিবাহিত হলেও সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গণহত্যা, নির্যাতন কেন্দ্র, বধ্যভূমি ও গণকবর সংরক্ষণের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিস্তার করতে হলে এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হলে এই স্থানগুলোর সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবরের স্থানগুলো সংরক্ষণ করে স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা এবং শহীদদের নামে বিভিন্ন রাস্তা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হলে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিস্তার লাভ করলে দেশে জঙ্গী মৌলবাদীদের সংখ্যা কমে আসবে এবং রাজাকার, আলবদরদের সামাজিকভাবে বয়কট করা সম্ভব হবে।

পাঁচগাঁও গণহত্যা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের জন্য আমি পাঠপর্যায়ে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী, শহীদ পরিবারের সদস্য, নির্যাতিত ও বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলে তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করেছি। এই সব তথ্যসংগ্রহের কাজে আমাকে যারা সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে পার্থ সারথী কর, রাজীব কুমার মণ্ডল, নিপুল দাস, উত্তম পালিত, রিচার্ড দত্ত, জসীম আহমদ চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ, গৌরিপদ মালাকার, জ্যোতির্ময় দেব, পাঁচগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান মিহির কান্তি দাস মঞ্জু, ইন্দ্রমণি মালাকার, সুবোধ মালাকার, সুখ শব্দকরের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পাঁচগাঁও উচ্চবিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র সৌরভ মালাকার ও বিকাশ মালাকার দিনভর আমার সাথে থেকে তথ্যসংগ্রহ, ছবি তোলা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহের পাশাপাশি তাদের ভাষ্য রেকর্ড করতে সার্বিক সহযোগিতা করেছে। তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া এই বইটি রচনায় আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যলয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক আহম্মেদ শরীফ ও গ্রন্থমালার সহযোগী সম্পাদক মামুন সিদ্দিকী। তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি **১৯৭১** গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্টের সভাপতি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের কাছে। তিনি **১৯৭১** *গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা* প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমরা তরুণ গবেষকরা মাঠপর্যায়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে প্রতিটি গণহত্যা, গণকবর, নির্যাতনকেন্দ্র ও বধ্যভূমি সম্পর্কে জানতে পারছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

চৈত্র **১৪২১**

তপন পালিত
tapan133@hotmail.com

ভৌগোলিক অবস্থান

মৌলভীবাজার জেলার উত্তরের উপজেলা রাজনগর। মৌলভীবাজার জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে রাজনগর একটি। রাজনগর থানা গঠিত হয় ১৯২২ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। এই উপজেলার উত্তরে বালাগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে কমলগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কুলাউড়া উপজেলা এবং পশ্চিমে মৌলভীবাজার সদর উপজেলা অবস্থিত। জেলা শহর হতে রাজনগর উপজেলার দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। এর আয়তন ৩৩৮.২৫ বর্গ কিলোমিটার। এই উপজেলাটির অবস্থান ২৪°২৬′ থেকে ২৪°৩৯′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৪৪′ থেকে ৯১°৫৮′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এ উপজেলার মনু, ধলাই ও কুশিয়ারা নদী এবং কাওয়াদিঘির হাওড়, ফারাক্কা ও পুখুরি বিল উল্লেখযোগ্য। রাজনগর উপজেলায় ৮টি ইউনিয়ন, ১৪২টি মৌজা এবং ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। ইউনিয়গুলো হলো– উত্তরভাগ, কামারচক, টেংরা, পাঁচগাঁও, ফতেহপুর, মনসুরনগর, মুন্সিবাজার ও রাজনগর। ৪টি মৌজা নিয়ে গঠিত রাজনগর উপজেলা শহরের আয়তন ৮.১৫ কিলোমিটার। রাজনগর উপজেলার একটি ইউনিয়ন পাঁচগাঁও। এর আয়তন ৭১৭৮ একর।

প্রাচীন দক্ষিণ শ্রীহট্টের বর্তমান নাম মৌলভীবাজার। এই জেলার রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ জনপদ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, নির্মাণশিল্প, সাংবাদিকতা, সাহিত্যচর্চা, চিত্তবিনোদন, অধ্যাত্ম ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে এই উপজেলাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জনার্দ্দন কর্মকারের তৈরি কামান, ধুলিজুরার শীতল পাটি, লোকজ সংস্কৃতির আধার মৃৎশিল্প, বাঁশের তৈরি ফুলদানি, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত বেতের তৈরি সামগ্রী, ধামাইল গান, মা-মেয়ের লোক নৃত্য, পৌষ সংক্রান্তির পূর্বে বাড়ির আঙ্গিনায় আলপনা অংকন ইত্যাদি এ উপজেলার কিছু বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে নারীমুক্তির সাধক লীলা নাগের জন্মস্থান পাঁচগাঁও গ্রাম ব্রিটিশ আমলে নারী জাগরণের জন্য ছিল সুপরিচিত।

কথিত আছে পাঁচটি বাড়ির নাম অনুসারে খনন করা পাঁচটি দিঘি পাঁচগাঁওয়ের নামের স্মৃতি বহন করছে। দিঘিগুলো হলো– নাগের দিঘি, চানক্যের দিঘি, পোদ্দারের দিঘি, কালিবাড়ির দিঘি ও দূর্গাবাড়ির দিঘি (যা পরবর্তীতে সরকার বাজার দিঘি নামে পরিচিত)। ঐতিহাসিক নিদর্শনের জন্যও এই ইউনিয়নটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬১ সালে পশ্চিমভাগ গ্রামের পরেশচন্দ্র পাল তাঁর বাড়ির

উত্তর পশ্চিম কোণে বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের সময়কার একটি তাম্রফলক পান। এই তাম্রফলকটি পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন নামে পরিচিত। আনুমানিক ৯৩০ সালে মুদ্রিত এই তাম্রশাসনটি ছিল ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের একটি নবায়নকৃত দলিল।

রাজনগর উপজেলার মানচিত্র *সৌজন্যে বাংলাপিডিয়া*

স্থানটির তৎকালীন অবস্থা

পাঁচগাঁও একটি ঐতিহাসিক গ্রাম। জেলা শহর হতে রাজনগর উপজেলার দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। পাঁচগাঁও গ্রামটি রাজনগর সদর থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। রাজনগর হতে ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম যেতে হলে মৌলভীবাজার সদর হয়ে যেতে হয়। ফলে রাজনগর থানার রাজনৈতিক বিকাশ ঘটেছে মৌলভীবাজার জেলার প্রভাবাধীনে। রাজনগর থানাও অনেক সময় মৌলভীবাজারকে প্রভাবিত করেছে। কড়াইয়ার হাওর আন্দোলনের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৯৭১ সালে রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে রাজনগর ও মৌলভীবাজার সম্মিলিতভাবে লড়াই করেছে।

রাজনগর একটি ঐতিহাসিক জনপদের নাম। পূর্বে এই জনপদের নাম ছিল 'ইটা' পরগণা। রাজা ভানুনারায়ণ ১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দে এই জনপদের নামকরণ করেন ইটার পরিবর্তে রাজনগর। ১৫৯৮ সালে ভানুনারায়ণের পুত্র সুবিদনারায়ণ পাঠান বীর খাজা ওসমানের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন। তাঁর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ জনপদে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের শাসনের অবসান ঘটে। তখন রাজনগরের নতুন নামকরণ হয় ওসমানগড়। খাজা ওসমানের সাথে মোঘলদের ছিলো চিরশত্রুতা। সেই শত্রুতার জের হিসেবে ১৬১২ সালে মোঘল ও আফগানদের মধ্যে যুদ্ধে খাজা ওসমান নিহত হন। খাজা ওসমানের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ওসমানগড়ে মোঘলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে রাজনগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই সময়ে রাজনগরের ইন্দেশ্বরের রমেশ চন্দ্র চৌধুরী কলকাতার পাটুয়াটুলী লেনে একটি প্রেস স্থাপন করেন। সেই প্রেস থেকে তিনি 'বিজয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ব্রিটিশবিরোধী লেখা ছাপা হতো। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে ঘরগাঁও-এর মৌলানা সিরাজউদ্দীন, বিচইকীর্তির মৌলভী আব্দুর রশীদ, ভবানীনগরের মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, নন্দীউড়ার সুরেন্দ্রনাথ অর্জুন, গোবিন্দবাটীর বসন্ত কুমার চক্রবর্তী, ঘরগাঁও-এর মৌলভী তসলিম উল্লা এবং পাঁচগাঁও-এর কালী কিশোর প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী বিপ্লবী লীলা নাগের বাড়ি রাজনগর পাঁচগাঁও গ্রামে। তিনি শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে

আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তাঁর ছিল অসামান্য অবদান। তিনি নারীদের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ও চেতনার স্ফূরণ ঘটানোর জন্য 'নারী শিক্ষা মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তা শেরে বাংলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। রাজনগরের খলাগ্রামের কমিউনিস্ট নেতা শংকর দেব ঘোষ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, রাজনীতি ও সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত ছিলেন।

পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী জাগরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু রাজনগরে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব তেমন ছিল না। কারণ রাজনগরের প্রভাবশালী দেওয়ান পরিবার রাজনগরকে মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিণত করেন। এই সময়ে রাজনগরের ছাত্রনেতা মকদ্দুস বখত ও তারা মিয়া প্রমুখ মুসলিম লীগ বিরোধী ধারার রাজনীতির সূচনা করেন। তারা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে রাজনগরে নিয়ে আসেন। তখন দেওয়ান পরিবারের সদস্য দেওয়ান আব্দুল বাছিত ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী। দেওয়ান আব্দুল বাছিতের ঘোর বিরোধিতার কারণে মওলানা ভাসানী রাজনগরে জনসভা করতে পারেননি। কিন্তু রাজনগর সদরের খুবই কাছেই গোবিন্দবাটী বাজারে আওয়ামী লীগ সমর্থিত জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তখন থেকে এখানে মুসলিম লীগ বিরোধী ধারার রাজনীতি শুরু হয়ে যায়।

১৯৫৪ সালের পূর্ব পকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির ফলে রাজনগরে মুসলিম লীগের প্রভাব কমে আসে। এই সময়ে মুসলীম লীগ সদস্য দেওয়ান আব্দুল বাছিত ও আব্দুল গফুরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ সুযোগে আওয়ামী লীগের রাজনীতির বিস্তার ঘটে। কিন্তু ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে গেলে তারা মিয়া ন্যাপে যোগদান করেন। অন্যদিকে মকদ্দুস বখত বিদেশ চলে যান। ফলে ষাটের দশকের শেষের দিকে এখানে মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনীতির শূন্যতা দেখা দেয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে রাজনগরে সংঘটিত হয় হাওর কড়াইয়া আন্দোলন। এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বীর কটু মিয়া। এই সময়ে অনেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের মধ্যে আব্দুল বারী, মোঃ জাফর, আব্দুল লতিফ, কবির বকস, মধুসূদন দাস, রণজিৎ দেব, আব্দুল মতিন, মতিউর রহমান, আব্দুল হামিদ খান, হানিফ খান, আব্দুর রহিম খান, সৈয়দ নজরুল হাসান, ইসমাইল মিয়া, নজাবত আলী, ইসহাক

চৌধুরী, হামদু মিয়া, আব্দুল মালিক, ফরমুজ আলী, মোহাম্মদ মোস্তফা, সদর উদ্দিন প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে রাজনগরের ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিলের আন্দোলন শুরু হলে এর প্রভাব পড়ে রাজনগরে। রাজনগর হাই স্কুল ছিল আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের নেতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আব্দুর রশীদ খান। পরবর্তীকালে ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র আন্দোলনে যারা জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে সিরাজুর রহমান চৌধুরী, দেওয়ান মুস্তাক মজিদ, মোহাম্মদ আজাদ, লুৎফর রহমান রাজি, মুস্তাফিজুর রহমান মানিক, আছকির খান, আচকান মিয়া, কুতুবুর রহমান, জালাল খান, সৈয়দ মাসুক আলী, ছয়ফুল ইসলাম, সৈয়দ খলিলুর রহমান মতচ্ছিন প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে রাজনগর এবং কমলগঞ্জের একাংশ নিয়ে নির্বাচনী এলাকা গঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন বালিসহস্র গ্রামের তোয়াবুর রহীম। তিনি নির্বাচনের অল্পদিন আগে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। এছাড়া মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন তৈমুছ মিয়া চেয়ারম্যান, ন্যাপের প্রার্থী ছিলেন তারা মিয়া এবং জামায়াতের প্রার্থী ছিলেন হাজী খলিলুর রহমান। নির্বাচন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৌলভীবাজারে আওয়ামী লীগের সমাবেশে যোগদান করেন। তিনি কুলাউড়া থেকে রওয়ানা হয়ে রাজনগর থানার টেংরা বাজারে আওয়ামী লীগের সমাবেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। টেংরা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে তৈরি সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "চারদিকে দুর্নীতিবাজ মুখোশ পরা দেশপ্রেমীরা রব তুলেছে– ইসলাম যায়, ইসলাম যায়– ইসলাম কি কচুপাতার পানি যে, পড়ে যাবে?" রাজনগরে এটাই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ সফর। আওয়ামী লীগ প্রার্থী ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা টালবাহানা শুরু করে। ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণের পর সারাদেশের মতোই রাজনগরের ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সর্বত্র রাজনৈতিক সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফয়জুর রহমান সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ঐ সভায় ছাত্ররা স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। সভা শেষে লাঠি হাতে একটি মিছিল মৌলভীবাজার শহরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু

পাকিস্তানি সৈন্যরা শহরে অবস্থান করার কারণে মিছিলটি শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। এরপর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মীর্জা ফরিদ আহমদ বেগ, গোলাম মওলা প্রমুখ নেতার প্রচেষ্টায় রাজনগর থেকে দেশপ্রেমিক যুবকরা মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য ভারতে পাড়ি জমায়। রাজনগর থেকে শতাধিক যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

রাজনগর উপজেলা শহরের কাছেই থাকার কারণে পাঁচগাঁও ইউনিয়নটি কিছুটা উন্নত ছিল। গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষি কাজ। অধিকাংশ বাড়ি ছিল মাটির তৈরি। তবে কিছু কিছু বাড়ি ছিল টিনের তৈরি। এছাড়াও শান্তিবাবুর বাড়ির দেবতার মন্দির ও হিরণ বাবুর বাড়িসহ কয়েকটি দালান বাড়ি ছিল। ১৯৭১ সালে হিন্দু প্রধান গ্রামটিতে কয়েক দফায় হামলা চালানো হয়। এ গ্রামে চক্রবর্তী, দাস, দেব, শব্দকর, মালাকার, নমশূদ্র প্রভৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস ছিল বেশি।

পাঁচগাঁও গ্রামের সাথে ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামের যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল মূলত সরু মেঠো পথ। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাওয়া এসব রাস্তা প্রায় প্রতিবছর ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হত। গ্রামের রাস্তা ছিলো মূলত কাঁচা, তবে যোগাযোগের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো ভ্যান ও রিকশা। বর্তমানে গ্রামের প্রায় প্রতিটি রাস্তাই পাকা। কিছু কিছু রাস্তা ইটের তৈরি। বর্তমানে বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয় রিকশা, টেম্পু ও সিএনজি।

৭ মে এই দিঘিতে হত্যা করে এই খালে গণকবর দেয়া হয়

গণহত্যার পটভূমি

মৌলভীবাজার জেলার নিভৃত পল্লী পাঁচগাঁও গ্রাম। গ্রামটি ছিল মূলত হিন্দু প্রধান। গ্রামবাসীর মধ্যে আগে থেকেই আতঙ্ক বিরাজ ছিল। তারা বুঝতে পারে যে, যে-কোনো সময় পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সাহায্যে গ্রামে প্রবেশ করতে পারে। সে জন্য সবাইকে আগেই বলা হয়েছিলো মন্দিরের ঘণ্টা বাজানো হলে ধরে নিতে হবে শত্রু গ্রামে ঢুকেছে। কিন্তু ৭ মে যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে হামলা করে তখন আর সে সুযোগ হয়নি।

পাকিস্তানি শাসনামলে পাঁচগাঁও গ্রামটি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে অতীতের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালির উপর। পাকিস্তানি বাহিনী বর্বর হামলা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা দেশের মতো পাঁচগাঁওবাসীও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেসময়ে পাঁচগাঁওয়ে যে কয়জন অগ্রণী নেতৃত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে উমাপ্রসন্ন দাস (ডা. শান্তিবাবু), হিরন্ময় দাস, অমূল্য চরণ দাস (মাখন বাবু), রমণ চন্দ্র ঘোষ, ধরণী কুমার ভট্টাচার্য্য, আনন্দ কিশোর ধর, রাজ মোহন দাস, বিধু ভূষণ দেব, ডা. সীতেষ চন্দ্র দে, পুতুল চন্দ্র অধিকারী, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুবল মালাকার, নরাই শব্দকর প্রমুখ। এছাড়াও যুবশক্তি হিসেবে খ্যাত অ্যাডভোকেট বন্ধু গোপাল দাস, ছাত্রনেতা হীমাংশু দে (বাবুল), মধুসূদন দাস, সরবিন্দু ভট্টাচার্য্য, মানিক কুমার ভট্টাচার্য্য, গিরবাণী ভট্টাচার্য্য প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা শুরু পূর্বেই রাজনগর থানায় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে গঠিত হয় থানা সংগ্রাম কমিটি। এই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল জব্বার চৌধুরী (মায়া মিয়া), জাফর মিয়া, লতিফ খান, আতাউর রহমান চৌধুরী, মোতাহির হোসেন, বাণী বাবু, আহাদ চৌধুরী, তারা মিয়া, আছকির খান, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। প্রতিদিন আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের উদ্যোগে মিছিল, মিটিং ও প্রতিবাদ চলতে থাকে। ২৭ মার্চ বিকেল ৩টায় পাকিস্তানি বাহিনী রাজনগরে প্রবেশ করে। তাদের প্রথম শিকারে পরিণত হন পাঁচগাঁও ইউনিয়নের ভূমিউড়া গ্রামের পণ্ডিত শ্যামাপদ কাব্যতীর্থ। এরপর সারা রাজনগরে নারী ধর্ষণ, খুন, লুটপাট ও ব্যাপকভাবে

অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। ১ মে দুপুরে একটি জিপে করে ৬ জন পাকিস্তানি সৈন্য পঞ্চেশ্বর গ্রামে হামলা চালিয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী নগেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস ও তার ভ্রাতৃষ্পুত্র মনি বিশ্বাসকে হত্যা করে লাশগুলো রাস্তায় ফেলে রাখে। একই দিনে ৩০-৩৫ জন পাকিস্তানি সেনা সামরিক ট্রাকসহ মুন্সীবাজারে গিয়ে দোকানপাট লুটপাট করে। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করে সনৎ ঠাকুর, ছায়াশীল, খোকা দেব, মুকুল দাস, রফিক, নজাবত, বাদশা ও ডা. বনমালী দাসকে হত্যা করে।

পাঁচগাঁও গ্রামেও সিলেট, মৌলভীবাজারসহ বিভিন্ন শহরের পাকিস্তানি বাহিনীর তাড়া খাওয়া মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য আশ্রয় নেয়। পাঁচগাঁও গণহত্যার এক সপ্তাহ আগে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর রাজাকাররা ডাকাতবেশে রমণ চন্দ্র ঘোষের বাড়িতে আক্রমণ করে। একই রাতে ডাকাতি করে রমেশ চন্দ্র ঘোষ ও দক্ষিণ পাঁচগাঁওয়ের সুখেশ চন্দ্র দেবের বাড়িতে। কয়েক লক্ষ টাকার মালামাল ডাকাতি করে নিয়ে যায়। গ্রামের কিছু মানুষ রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখায়। এসব রাজাকাররা গ্রামের সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে গ্রাম ছাড়া করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তারা সফল হতে পারেনি। রাজনগর থানার তৎকালীন ওসি মতিউর রহমান পাঁচগাঁও গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন সময় এলাকাবাসীকে অভয় দিয়ে আসেন। সর্বশেষ তিনি ৫ মে গ্রামে এসে তাদের আশ্বাস দেন। এলাকাবাসীকে গ্রাম ছাড়া করতে ব্যর্থ হয়ে মৌলভীবাজারে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানায় স্থানীয় রাজাকার আলাউদ্দিন চৌধুরী। গ্রামবাসীরা জানান, গ্রামের কুখ্যাত রাজাকার আলাউদ্দিন চৌধুরী ও হারিছ উল্লাহ স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীকে গ্রামে নিয়ে আসে। গণহত্যার আগের দিন অর্থাৎ ৬ মে থেকে পাঁচগাঁও গ্রামের অবস্থা গুমট হয়ে পড়ে। আলাউদ্দিন ও হারিছ রাজাকারের চালচলন রহস্যজনক মনে হয়। কিন্তু গ্রামবাসী কল্পনাও করতে পারেননি আলাউদ্দিন ও হারিছ প্রমুখ রাজাকাররা এতো নির্মম হতে পারে। কারণ ৫ মে ওসি এসে তাদের আশ্বাস দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই আশ্বাস তাদের মানসিকভাবে চাঙ্গা রেখেছিলো। কয়েকজন পরিস্থিতি খারাপের আশঙ্কায় গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ডাকাতির ভয়ে গ্রামে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে লোক প্রতিরাতে গ্রামের রাস্তার মাথায় পাহারায় থাকে। গ্রামবাসী বলেন, পাঁচগাঁও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর চেনার কথা নয়। রাজাকাররাই তাদের গ্রামে নিয়ে এসেছে।

পাঁচগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা ঘটে। ২৯ নভেম্বর রাজনগরের খলা গ্রামের শতদল ধর, প্রতাপ চন্দ্র পুরকায়স্ত, মনোরঞ্জন দাস, শ্যামল ধর, সজল ধর, যতীন্দ্র মোহন ঘোষ, অখিল বাবু, অরবিন্দ বাবু, সুকেশ বাবু, বিজয় দাস, বাবুল ঘোষ, পরিমল দাস ও ক্ষিরোদ দেব সহ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। পাকিস্তানি হানাদারদের গুলিতে গুরুতর আহত সুশীতল ধর তিন চারদিন অন্য বাড়িতে পলাতক অবস্থায় মারা যান। নিশিরঞ্জন ঘোষ চিকিৎসার পর বেঁচে যান। উত্তরভাগ হাসপাতালের ডা. যামিনী কুমার দেবকেও তারা হত্যা করে। এছাড়া শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন– শামসু মিয়া, বাতির মিয়া, মনির মিয়া, প্রদীপ চন্দ্র দাস, সুদর্শন দেব, অরুণ চন্দ্র দত্ত, শিশির রঞ্জন দেব, সত্যেন্দ্র কুমার দাস, তরণী কুমার দেব, তারা মিয়া, সিপাহী আব্দুল্লাহ ও শামসুল আলম হুদা প্রমুখ অন্যতম। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার অপরাধে বালিগাঁওয়ের প্রবাসী দানু মিয়াকে হত্যা করা হয়।

এই দিঘিতে ৭ মে পাঁচগাঁও গ্রামের মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

৭ মে রাতে প্রায় ৫০-৬০ জন পাকিস্তানি সৈন্য লীলা নাগের পৈতৃক বাড়িতে দখল করে থাকা আলাউদ্দিন চৌধুরী ও অন্যদের সাথে কিছুক্ষণ শলাপরামর্শ করে গণহত্যার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘুমন্ত নিরীহ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেদিন রাতে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। গ্রামের নিরীহ মানুষ সারাদিন কাউয়াদিঘী হাওরে বোরো ধান কাটা শেষে যখন রাতের বেলা গভীর ঘুমে মগ্ন ঠিক তখনই ভোর রাতে আলাউদ্দিন চৌধুরী, ডা. আনা মিয়া, আব্বাস মেম্বার, আব্দুল মতিনসহ কয়েকজন রাজাকার ৫০-৬০ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে পাঁচগাঁও গ্রাম ঘিরে ফেলে। বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে গ্রামের নিরীহ মানুষকে ধরে আনে এবং বলতে থাকে "পাঁচগাঁও মে চক্কর দেগা, সরকার বাজার মে মিটিং করেগা, উচকো বাদ তুমকো ছোড় দেগা।" রাজাকাররা বলে, তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলো। শান্তির মিটিং করেই তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে। গ্রামে শুরু হয় লুটপাট। মহিলা ও শিশুদের ঘর থেকে বের করে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

ঘুমন্ত মানুষ আকস্মিক হামলায় দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। এই সুযোগে রাজাকাররা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে ধান, চাল, আসবাসপত্র, সোনা-গহনা, গরু-ছাগল লুট করতে থাকে। অন্যদিকে আলাউদ্দিন রাজাকারসহ কয়েকজন কয়েকটি বাড়িতে প্রবেশ করে শুরু করে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ। মহিলারা স্বামী-সন্তানের কথা বলে অনেক অনুনয় বিনয় করেও তাদের সম্মান রক্ষা করতে পারেননি। পাকিস্তানি বাহিনী রাজাকারদের সহযোগিতায় সারা গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। অবশিষ্ট কিছু বাড়ি-ঘর ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাদের সাথে যোগ দেয় আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের লোক। মিটিংয়ের কথা বলে ভোর রাতে হিরণ বাবুর বাড়ির দিঘির পাড়ে শতাধিক লোককে একত্র করা হয়।

চারদিক তখনো হালকা অন্ধকার। গ্রামবাসীকে পশ্চিম দিকে মুখ করে দিঘির পাড়ে বসতে বলে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে। আত্তর মণ্ডল ও মদরিছ মিয়া প্রমুখ রাজাকার সমবেত গ্রামবাসীকে একজনের মাথা অন্যজনের পায়ের সাথে বেঁধে জোড়া জোড়া করে দিঘির পানিতে একে একে লাথি মেরে ফেলে দেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঁধা অবস্থায় পানিতে ফেলে দেয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করা মানুষগুলোকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে

হত্যা করে। মানুষগুলোর মৃত্যু নিশ্চিত করে পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে যায়। দিঘির জলে কচুরিপানার মতো ভেসে ওঠে লাশ আর লাশ।

এই পৈশাচিক গণহত্যার শিকার গ্রামবাসীর ৬৯ জনের নাম পাওয়া যায়। নিহতদের মধ্যে নিত্য রাণী শব্দকর নামে একজন মহিলাও ছিলেন। দৈবক্রমে বেঁচে যান কয়েকজন। তারা হলেন সাধু শব্দকর, কটি শুক্লবৈদ্য, চরিত্র শব্দকর, সুখময় শব্দকর, নারায়ণ মালাকার প্রমুখ। এদের কারো নাকে, কানে, কারো হাতে বা পায়ে গুলি লেগেছিল। নিরীহ গ্রামবাসীর রক্তে দিঘির পানি লাল হয়ে গিয়েছিল। নিহতদের মৃতদেহ সারা দিন সেখানে পড়ে থাকে। পরদিন গ্রামের কিছু লোক পুকুরে জাল ফেলে লাশ তুলে দিঘির পশ্চিম পাড়ে সমাহিত করেন। পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ে নিহতদের লাশ আত্মীয়স্বজনেরা দাহ করতে পারেনি।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাঁচগাঁও গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে যায় মৌলভীবাজার কলেজের ছাত্র নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, রসময় চক্রবর্তী, দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, খোকা ভট্টাচার্য্য, বিনোদ চক্রবর্তী, হিরন্ময় দাশ, মাখন দাশ, রজনী দেব এবং ছটই চৌকিদারসহ ১৪ জনকে। তাদের কোনো সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি।

গণহত্যা-নির্যাতনকারীর পরিচয়

পাঁচগাঁও গণহত্যার প্রধান হোতা রাজাকার আলাউদ্দিন চৌধুরী। তার সাথে সহযোগিতা করে স্থানীয় আরও কিছু রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্য। ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হলে রাজাকাররা মনে করেছিল পাঁচগাঁও গ্রামের হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে। রাজাকাররা নিরীহ গ্রামবাসীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ না হওয়াতে তারা শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখায়। পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা ও শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এপ্রিল মাসে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে দেওয়ান আব্দুল বাছিত ও জসীম উদ্দিন শান্তি কমিটিকে সহায়তা করেন। রাজনগরে শান্তি কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন আকমল খান, আব্দুল গফুর ও আব্দুল করিম। থানার অন্যান্য সহযোগী হলেন– ছইদ, মান্নান, বদরুল, শামছুল, নূরুল, বারিক, নজমুল, রইছ, সুরুজ, সাজিদ, মতিন, ফিরোজ, আলাউদ্দিন, গণি, ইরফান, আজিজ, দুদু, আবুল ও আকতার প্রমুখ। দুদু মিয়া ও ইরফান আলী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারান।

ক্রমিক	নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১	আলাউদ্দিন চৌধুরী	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২	হারিছ উল্লাহ	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩	আব্বাস মেম্বার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪	মদরিস মিয়া	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫	ওয়াব উল্লাহ	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৬	রসিদ উল্লাহ	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৭	ডাক্তার আনা মিয়া	পশ্চিমভাগ	পাঁচগাঁও
৮	টেন্টন মণ্ডল	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৯	আব্দুল মতিন	খাঁরপাড়া	পাঁচগাঁও
১০	আত্তর মণ্ডল	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১১	গফুর মেম্বার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১২	আকবর আলী	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও

(অসম্পূর্ণ)

আলাউদ্দিন চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বছর আগে রাজাকার আলাউদ্দিন ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে। এরপর পাঁচগাঁও গ্রামে বিপ্লবী নারী লীলা নাগের পিতৃগৃহ দখল করে বসবাস শুরু করে। ১৯৭১ সালে আলাউদ্দিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয়। সে হত্যা, লুটতরাজ, নারী নির্যাতনসহ মানবতাবিরোধী কাজে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করে। আলাউদ্দিনই ৭ মে পাকিস্তানি বাহিনীকে পাঁচগাঁও গ্রামে নিয়ে আসে। তার সাথে যোগ দেয় স্থানীয় আরও কিছু রাজাকার।

আলাউদ্দিন সম্পর্কে বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা প্রবাসী মালাকার বলেন, 'আমরা প্রিয়জন এবং সম্ভ্রম হারিয়ে শোকে বিহ্বল ছিলাম। পরদিন রাতে আলাউদ্দিন আসে আমাদের বাড়িতে। আমাকে ধর্মের বোন বলে সম্বোধন করে। আমাকে বলে, ঘরে এভাবে ধান-চাল রাখলে লুট

হয়ে যাবে। লুটতরাজের হাত থেকে রক্ষার জন্য সে ধান-চাল তাকে দিয়ে দিতে বলে। সে আশ্বস্ত করে, যখন যা প্রয়োজন তার কাছে থেকে চেয়ে নিতে। আলাউদ্দিনের প্রস্তাবে সাড়া দেয়া ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। গুরুতর আহত স্বামীকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম আমি ও আমার অন্য দুই জা। দেড়শ' মণ ধান ছিল ভাড়ারে। চালও ছিল দশ মণের মতো। সেদিন রাতভর আমাদের বাড়ি থেকে ধান-চাল, কাপড়-চোপড় সব নিয়ে যায় আলাউদ্দিন ও তার লোকজন। তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি বাড়িতে।

দুদিন পর ঘরে চাল শেষ হলে তার কাছে চাল আনতে যাই। চালের বদলে সে পাঁচ সের ধান দেয় আমাকে। বলে, চাল নেই, লুট হয়ে গেছে। এভাবে মাত্র পাঁচদিন ধান দিয়েছিল আলাউদ্দিন। ট্রাঙ্কভর্তি কাপড় থাকলেও আমাকে এক কাপড়ে থাকতে হয়েছে। কাপড় চাইলে একই উত্তর দিয়েছে সে।

রাজাকার আলাউদ্দিন চৌধুরী লীলা নাগের মায়ের স্মৃতি বিজরিত কুঞ্জলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন সমাজপতি সেজে কাজ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এলাকাবাসী আলাউদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘৃণ্য ভূমিকার কথা চিন্তা করে তাকে আর সভাপতি নির্বাচিত করেননি।

ডাক্তার আনা মিয়া

রাজাকার ডাক্তার আনা মিয়া স্বাধীনতার পর পল্লী চিকিৎসক সেজে রাজনগর উপজেলার সমাজসেবক হিসেবে নিজের অতীতকে ধামাচাপা দিয়ে দিন অতিবাহিত করেন।

আব্দুল মতিন

খাঁরপাড়ার রাজাকার আব্দুল মতিন স্বাধীনতার পর রাজনগর থেকে মৌলভীবাজার সদরের চাঁদনীঘাট এলাকায় বাসাবাড়ি করে বিলাস বহুল জীবনযাপন করেন।

শহীদ শনাক্তকরণ

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে হিন্দু প্রধান পাঁচগাঁও গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী কয়েকশ লোককে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ৭ মে তারিখেই হত্যা করা হয় শতাধিক লোককে। অনেককে গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে অন্যস্থানে হত্যা করা হয়। আবার এমনও দেখা গেছে যে, শহর থেকে অনেকে এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদেরও হত্যা করা হয়েছে। পাঁচগাঁও গণহত্যায় যাদের নাম ও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক	নাম	বয়স	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১.	কৃষ্ণ চক্রবর্তী	৪০	কৈলাশ চক্রবর্তী	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২.	অমূল্যচরণ দাশ (মাখন)	৭০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩.	শান্ত চক্রবর্তী	৪০	অজ্ঞাত	পশ্চিমবাগ	পাঁচগাঁও
৪.	বিনোদ চক্রবর্তী	৬০	অজ্ঞাত	পশ্চিমবাগ	পাঁচগাঁও
৫.	রসময় চক্রবর্তী	৫৮	অজ্ঞাত	পশ্চিমবাগ	পাঁচগাঁও
৬.	দেবেন্দ্র চক্রবর্তী	৫৯	অজ্ঞাত	পশ্চিমবাগ	পাঁচগাঁও
৭.	খোকা চক্রবর্তী	৫০	অজ্ঞাত	পশ্চিমবাগ	পাঁচগাঁও
৮.	হিরণময় দাশ	৭০	হেমময় দাশ	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৯.	কুমুদ চন্দ্র নাগ	৬৮	অজ্ঞাত	সিলেট	পাঁচগাঁও
১০.	পুতুল চন্দ্র অধিকারী	৩৭	দয়াময় অধিকারী	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১১.	অভয় চন্দ্র দেব	৬০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১২.	ললিতা দাশ	৬০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১৩.	সুরেন্দ্র মালাকার-১	৬০	শুন মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১৪.	নরেন্দ্র মালাকার	৫০	শুন মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১৫.	গোপেশ চন্দ্র মালাকার	৫০	গিরিশ মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১৬.	নরী মালাকার	৪৫	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১৭.	লঙ্গু মালাকার	৩৮	ধনাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১৮.	বিধু মালাকার	৫৫	ধনাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও

ক্রমিক	নাম	বয়স	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১৯.	রস মালাকার	৩৭	রমাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২০.	সুবল মালাকার	৭২	বরাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২১.	সুকেশ মালাকার	২৫	সুবল মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২২.	বিমল মালাকার	৫৬	বরাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২৩.	বীরেশ মালাকার	২৮	বরাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২৪.	সতিশ মালাকার	৩৫	নদাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২৫.	টুনা সাধু	৬০	বরাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২৬.	পুতুল মালাকার	৩৭	সূর্য মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২৭.	সুরেন্দ্র মালাকার-২	৬৫	কুসাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২৮.	আদাই মালাকার	৭০	সুর মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২৯.	রমন মালাকার-১	৭০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩০.	লাল মালাকার	২৭	রমন মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩১.	ঈরেশ মালাকার-১	২৮	উমেশ মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩২.	উমেশ মালাকার	৬৫	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩৩.	ঈরেশ মালাকার-২	২৮	ইনাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩৪.	রবি মালাকার	৩০	লব মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩৫.	কুমার মালাকার	৭০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩৬.	নগেন্দ্র মালাকার	৩৭	কুমার মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩৭.	রমন মালাকার-২	৬২	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩৮.	রঞ্জন মালাকার	২৫	রমন মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩৯.	নিত্য রাণী শব্দকর	৬০	রবিয়া শব্দকর (স্বামী)	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪০.	নগরী শব্দকর	৭০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪১.	গোপাল মালাকার	৪৫	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪২.	অভিরাম শব্দকর	৬৬	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪৩.	রমনরাম শব্দকর	৬৭	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪৪.	নবরাম শব্দকর	৬৩	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও

ক্রমিক	নাম	বয়স	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৪৫.	কুটি শব্দকর	৬৫	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪৬.	মনাই শব্দকর	৬৫	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪৭.	শ্যাম শব্দকর	৪০	নিরোদ শব্দকর	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪৮.	বীরেশ শব্দকর	৩২	নিরোদ শব্দকর	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪৯.	উপাই শব্দকর	৫৫	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫০.	মনাইরাম শব্দকর	৭০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫১.	হরেন্দ্র শব্দকর	৪০	মহিন্দ্র শব্দকর	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫২.	ব্রজেন্দ্র শব্দকর	২৫	অক্ষয় শব্দকর	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫৩.	পরেশ শব্দকর	২৫	কটন শব্দকর	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫৪.	নরাই শব্দকর	৭০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫৫.	শার শব্দকর	৬০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫৬.	নরেশ চন্দ্র দেবনাথ	৬০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫৭.	উপেন্দ্র মালাকার	৪৫	উমাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫৮.	নরেন্দ্র শব্দকর	৩০	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫৯.	নিরোদ শব্দকর	৭২	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৬০.	রবি শব্দকর	৭৫	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৬১.	সুনাতন নমশূদ্র	৬০	অজ্ঞাত	খানিকুল	পাঁচগাঁও
৬২.	পরেশ নমশূদ	৪৫	গুন শব্দকর	খানিকুল	পাঁচগাঁও
৬৩.	বসন্ত নমশূদ্র	৭০	অজ্ঞাত	খানিকুল	পাঁচগাঁও
৬৪.	পিয়ারী নমশূদ্র	৭০	অজ্ঞাত	খানিকুল	পাঁচগাঁও
৬৫.	জ্যোতি নমশূদ্র	৪৫	অজ্ঞাত	খানিকুল	পাঁচগাঁও
৬৬.	নগরী মালাকার	৮০	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৬৭.	রজনী কান্ত দেব	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৬৮.	রমনী দেব	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৬৯.	নগেন্দ্র দেব	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৭০.	চুনা বৈষ্ণব	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও

ক্রমিক	নাম	বয়স	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৭১.	ভগাই মালাকার	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৭২.	বাদল মালাকার	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৭৩.	কাউয়া মালাকার	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৭৪.	সৈয়দ নজাবত আলী	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৭৫.	বাদশা মিয়া	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৭৬.	রফিক উদ্দিন	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৭৭.	সনৎ চক্রবর্তী	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৭৮.	মুকুল দাশ	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৭৯.	মতিলাল দাশ	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮০.	খোকা সূত্রধর	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮১.	নরেশ সূত্রধর	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮২.	নগেন্দ্র বিহারী দাশ	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮৩.	বনমালী দাশ	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮৪.	সুরেশ ধর	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮৫.	বন্ধু গোপাল ধর	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮৬.	দানু মিয়া	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮৭.	অরবিন্দ ধর	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮৮.	সুখেশ ধর	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৮৯.	নিশিরঞ্জন ধরসহ ১৭জন	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৯০.	মনির আহমদ	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৯১.	বাতির মিয়া	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৯২.	প্রদীপ দাস	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৯৩.	সুদর্শন দেব	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৯৪.	শিশির দেব	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৯৫.	সত্যেন্দ্র কুমার দেব	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৯৬.	অবনী কুমার দেব	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৯৭.	টেনাই মিয়া	-	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও
৯৮	বসন্ত নমশূদ্র	-	অজ্ঞাত	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও

(অসম্পূর্ণ)

ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী পাঁচগাঁও গ্রামে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা চালায়। ৭ মে গ্রামে হামলার পর নিরীহ গ্রামবাসীকে হিরণ বাবুর দিঘির পাড়ে জড়ো করে হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়া হয়। পানিতে ফেলে দেয়ার পর তাদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু দৈবক্রমে সেদিন কয়েকজন বেঁচে যান। এছাড়াও পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীরা কয়েকবার গ্রামে হামলা করে। নিম্নে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের শিকার কয়েকজন ভুক্তভোগীর তালিকা দেওয়া হলো :

ক্রমিক	নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১	বিনোদ চক্রবর্তী	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২	কুমুদ দেব	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩	খটী শুক্লবৈদ্য	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪	নারায়ণ মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫	সুবোধ মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৬	সুখময় শব্দকর	ভূমিউড়া	পাঁচগাঁও
৭	যামিনী মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৮	সাধু শব্দকর	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৯	চরিত্র শব্দকর	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১০	বগাই মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১১	বকুল মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১২	লাড়ু মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১৩	জিতেন্দ্র মালাকার জিতু	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১৪	গোপাল মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
১৫	মহেন্দ্র শব্দকর	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও

(অসম্পূর্ণ

বীরাঙ্গনার তালিকা

পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় পাঁচগাঁও গ্রামে হামলা চালিয়ে শতাধিক লোককে হত্যার পাশাপাশি নারী ধর্ষণেও মেতে উঠে। স্থানীয় রাজাকাররা হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণে নেতৃত্ব দেয়। নির্যাতিত নারীদের ভাষ্য থেকে জানা যায় স্থানীয় রাজাকার আলাউদ্দিন চৌধুরী, আব্বাস মেম্বার, আনাই ডাক্তার প্রমুখের নেতৃত্বে রাজাকাররা তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। শত অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে তাদের বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। গ্রামের অনেক বাড়িতেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। কিন্তু কেউ তা প্রকাশ করতে রাজী হননি। নারায়ণ মালাকারের বাড়িতে একই পরিবারের তিন গৃহবধুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের মাত্র এক মাসের একটি সন্তান মারা যাবার কয়েকদিন পরেই এই নির্যাতন করা হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনি দুইদিন অজ্ঞান ছিলেন। পরবর্তীকালে ধর্ষিতা অনেককে আবার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। তাই সকলের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সাক্ষাৎকার ও বইপত্র থেকে কয়েকজন বীরাঙ্গনার নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। নিম্নে বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা দেওয়া হলো :

ক্রমিক	নাম	স্বামী	গ্রাম	ইউনিয়ন
১	প্রবাসী মালাকার	নারায়ণ মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
২	শান্তি মালাকার	লঙ্গু মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৩	বাসন্তী মালাকার	বিধু মালাকার	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৪	মায়া রাণী (১)	পরান শব্দকর	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও
৫	মায়া রাণী শব্দকর (২)	অজ্ঞাত	ভূমিউড়া	পাঁচগাঁও

(অসম্পূর্ণ)

নির্যাতিতদের মৌখিক ভাষ্য

রাজনগর উপজেলায় সংঘটিত সব চেয়ে বড় গণহত্যা হচ্ছে ৭ মে সংঘটিত পাঁচগাঁও গণহত্যা। এই গণহত্যায় শতাধিক লোককে হত্যা করা হলেও কয়েকজন দৈবক্রমে বেঁচে যান। তাদের মধ্যে বর্তমানে জীবিত দুইজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা নিজের মুখে বর্ণনা করেছেন সেদিনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞাতা কথা। নিম্নে তাদের মৌখিক ভাষ্য তুলে ধরা হলো:

সুবোধ মালাকার (৮২)

পিতা: সুবল মালাকার, মাতা: নীরুবালা মালাকার, গ্রাম: পাঁচগাঁও, ইউনিয়ন: পাঁচগাঁও, থানা: রাজনগর, জেলা: মৌলভীবাজার, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ জানুয়ারি ২০১৫

রাজাকার আলাউদ্দিন পাকিস্তানি আর্মিদের আমাদের গ্রামে নিয়ে আসে। আলাউদ্দিন ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছিল। সে একজন রিফিউজি। এই রিফিউজিই আমাদের সর্বনাশ করেছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রথমে আসে আলাউদ্দিনের বাড়িতে। এরপর ভোর রাতে ৬-৭ জন করে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের সাথে স্থানীয় রাজাকাররা আমাদের বাড়িতে এসে বলে শান্তির মিটিং আছে। সবাইকে একত্র হয়ে দিঘির পাড়ে যেতে বলে। আমরা ছিলাম গ্রাম পাহারায়। বাড়িতে চিৎকার শুনে চলে আসি। এসে দেখি পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়িতে আক্রমণ করেছে। এরপর আমাদের ধরে হিরণ বাবুর বাড়ির সামনের দিঘির পাড়ে নিয়ে যায়। শান্তি কমিটির মিটিং হবে বলে গ্রামের সবাইকে সেখানে একত্র করে। আমরা মনে করেছিলাম যে মিটিং হবে। আমরা বুঝতে পারিনি যে, ওরা সবাইকে হত্যা করার জন্য একত্র করছে। কারণ স্থানীয় রাজাকাররা আমাদের বলেছিল আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। দিঘির পাড়ে যাবার পর আমাদের সবাইকে পশ্চিম দিকে মুখ করে বসতে বলে। আমরা তাদের কথা মতো বসে থাকি।

দিঘির কাছেই ছিল একটা গভীর খাল। সেই খালের পাশে ছিল একটি আমলকি গাছ। সেই গাছের নিচে পাকিস্তানি সৈন্যরা একটি মেশিনগান ফিট করে। আমার বাবা কাকা সবাই ছিলেন সেখানে। পশ্চিম দিকে মুখ করে বসেছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে কথা

বলছিল। কিন্তু তাদের কথা আমরা বুঝতে পারিনি। সেদিন ছিল শুক্রবার এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই কিছুটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমাদের শরীরের কাপড় খুলে সবাইকে ওরা বেঁধে ফেলে। পাকিস্তানিরা প্রথমে পুতুল গোসাই নামে একজনকে বলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে ওকে হত্যা করা হবে না। কিন্তু সে তাদের কথা শুনেনি। সে বলে আমার সবাই মারা যাচ্ছে, আর আমি বেঁচে থেকে কি করব? তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর। এই কথা শুনে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। প্রথমে তাকে হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে ২টি গুলি করে। কিন্তু তখনও মারা যায়নি বলে ৩ নম্বর গুলি করে। সেই গুলির আঘাতে সে পানিতে ডুবে যায়।

সুবোধ মালাকার

কিছুক্ষণ পর আমাদের সবাইকে রাজাকাররা বেঁধে ফেলে। এরপর লাথি মারতে থাকে। আমরা যারা সেখানে জড়ো হয়েছিলাম তাদের শরীরের কাপড় দিয়ে একজনের মাথার সাথে অন্যজনের পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় গুলি। আমাকে বাঁধার পর আমি আর কিছুই বলতে পারিনি। এরপর একে একে আমাদের সবাইকে পানিতে ফেলে নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। আমার সাথে যামিনী মালাকার নামে একজনকে বেঁধে পানিতে ফেলেছিল। আমি কিভাবে বেঁচে যাই জানি না। জ্ঞান ফেরার পর আমি নারায়ণ মালাকারের বাড়িতে আশ্রয় নিই। সেখানেই কিছুদিন লুকিয়ে থাকি। এরপর আমার আর কিছু মনে নেই।

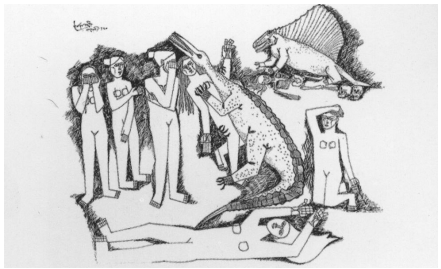

মুর্তজা বশীর
বাংলাদেশ ১৯৭১
কালি ও কলম, ১৯৭২

সুখময় শব্দকর (৬৫)

পিতা: নিরোদরাম শব্দকর, মাতা: অমৃকা শব্দকর, গ্রাম: ভূমিউড়া, ইউনিয়ন: পাঁচগাঁও, থানা: রাজনগর, জেলা: মৌলভীবাজার, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৪ জানুয়ারি ২০১৫

১৯৭১ সালের ৩০ বৈশাখ ভোরে ঘটনাটা ঘটে। আমরা হঠাৎ করে চতুর্দিকে চিৎকার শুনি। সারা গ্রামে আগুন লাগানো হয়। আশেপাশের বাড়ি থেকে চিৎকার শুনতে পাই। আমাদের বাড়িতে আমরা পুরুষ মানুষ ছিলাম ৮ জন। আমার বাবা, দুই ভাই, চার কাকা এবং আমি। চিৎকারের শব্দ শুনে বাড়ি থেকে বাইরে বের হয়ে দেখি চতুর্দিকে শুধু লাল আর লাল আগুন। তখন দেখি দেওয়ান বাড়ির টেন্টন মণ্ডল ও পশ্চিমবাগের আনাই ডাক্তার পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে আমাদের বাড়ির উত্তরদিক দিয়ে প্রবেশ করে। তাদের সাথে ছিল প্রচুর মানুষ। অনেকে তাদের সহযোগী হিসেবে এসেছে আবার অনেককে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে নিয়ে এসেছে। আমাদের এসে বলে যে মিটিং আছে তাই সবাইকে একত্র হতে হবে। আমার এক ভাই বুঝতে পেরে মহিলাদের শাড়ি পরে পালিয়ে যান। আমরা পাকিস্তানিদের সাথে যাওয়া শুরু করি। হঠাৎ করে আমি বাড়ির পশ্চিমের রাস্তায় গিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে পুকুরে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে লুকিয়ে থাকি। সৈন্যরা আমার পিছন পিছন এসে পুকুরে কয়েক রাউন্ড গুলি করে চলে যায়।

সুখময় শব্দকর

কিছুক্ষণ পর আমি পুকুর থেকে উঠে আসি। কিন্তু পালাতে পারিনি। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আবার ধরা পরি। এরপর সবাইকে হিরণ বাবুর দিঘির পাড়ে জড়ো করা হয়। বাড়ির মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা সবাইকে প্রথমে পশ্চিমদিকে মুখ করে বসিয়ে রাখে। তারপর পাকিস্তানিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। কিছুক্ষণ পর দিঘির শানবাঁধানো ঘাটে একজনের পায়ের সাথে অন্যজনের মাথা বেঁধে লাথি মেরে পানিতে ফেলে দেয়। এরপর শুরু করে গুলি। একজনের উপর আরেক জন পড়ে থাকে। অনেকের সাথে কলা গাছ বেঁধে পানিতে ফেলে। আমি আর কিছু বলতে পারিনি।

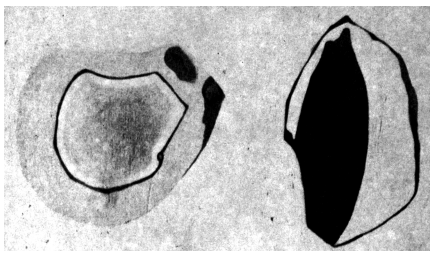

মুর্তজা বশীর
শহীদ শিরোনাম
তেল রং, ১৯৭৬

দুপুরের দিকে আমার জ্ঞান ফিরে। তখন দেখি কান থেকে রক্ত ঝরছে। সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ির পশ্চিমদিকের একটি খালে লুকিয়ে থাকি। সন্ধ্যার পর খাল থেকে উঠে গ্রামের পশ্চিমদিকের রক্তা গ্রামে চলে যাই। রক্তার কাসিম মাস্টারের বাড়ি গিয়ে দেখি অনেক হিন্দু সেখানে জমা হয়েছে। আমার পরনে তখন কোনো কাপড় ছিল না। মাস্টারের বাড়ির লোকেরা পরার জন্য কাপড় দেন। আমরা যারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সবাই একে অন্যকে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল। আমরা আশ্রয়হীন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক দিন তাদের বাড়ি ছিলাম। অনেকে ভিক্ষা করে নিজেদের খাবারের ব্যবস্থা করে।

আমার সাথে চরিত্র শব্দকর নামে একজন ছিল। ও সেদিন গুলি খেয়ে বেঁচে গিয়েছিল। আমরা দুজন মাস্টার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এরপর চরিত্রকে বললাম, ভাই তোরও কেউ নাই, আমারও কেউ নাই। চল আমরা ভারত চলে যাই। আমরা দুজন বগলে দুটি কাপড়ের পুটলি নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। কিন্তু আমাদের গ্রাম পার হয়ে মুন্সিবাজারের কাছে আঞ্চলগাঁও যাওয়ার পর এক লোক আমাদের ডাক দেয়। সেই লোককে দেখে আমরা ভয় পেয়ে যাই। মনে করেছিলাম এই লোক রাজাকার। আমাদের ধরে হত্যা করবে। কিন্তু কাছে যাবার পর দেখি এক লোক আমাকে চিনে। তারা আমাদের সম্পর্কে জানতে চায়। আমি তাদের বলি আমাদের মা বাবা ভাই বোন বউ কে কোথায় আছে আমরা কিছুই জানি না। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমার কে কে মারা গেছে? আমি বললাম আমার দুই ভাই ও বাবাকে ওরা হত্যা করেছে। অন্য সবাই কোথায় কী অবস্থায় আছে আমি জানি না। তারপর ওরা আমার মা এবং স্ত্রীর বর্ণনা শুনতে চায়। আমি তাদের আমার মা ও স্ত্রী সম্পর্কে বলি। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে তাদের কোনো চিহ্ন আছে কি না? আমি বলি আমার মায়ের হাতের আঙ্গুল ছোট ছোট। আমার বউয়ের হাতেও কিছুটা সমস্যা আছে। এরপর তারা আমার মা, বউ এবং ভাইয়ের বউয়ের পরনে কী ধরনের শাড়ি ছিল তাও জানতে চায়। আমি যতটা সম্ভব তাদের বলি। তখন তারা আমাদের বলে যে, এখন তোমরা চলে যাও। বিকেল ৪-৫টার দিকে চলে এসো। এরপর আমরা তোমাদের বলবো কী করতে হবে।

আমরা দুজন তাদের কথায় চিন্তায় পরে গেলাম। এরা যদি আমাদের পাকিস্তানিদের হাতে ধরিয়ে দেয়? এরপর আমরা থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে বিকেলে ফিরে আসি। তখন সেই লোক আমাদের করই [চাল ভাজা] খেতে দেয়। এবং বলে যে

আমার গোয়াল ঘরে লুকিয়ে থাকো। আমরা তাই করি। আমাদের কাছ থেকে আত্মীয়-স্বজনের বর্ণনা শুনে তারা যাদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের সাথে মিলিয়ে দেখে। সন্ধ্যার পর আমাদের এসে বলে তোমরা যে বর্ণনা দিয়েছো সে রকম অনেক মহিলা এখানে আছে। তোমাদের সেখানে নিয়ে যাব। কিন্তু তোমরা কান্নাকাটি করতে পারবে না। আর কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে তার স্বামী বা ভাইকে দেখেছো কি না? তখন বলবে যে আসার সময় রাস্তায় তার সাথে তোমাদের দেখা হয়েছে। কেউ মারা গেছেন এটা বলা যাবে না। এর পর আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে বলে কেউ যদি এদের দেখে কান্নাকাটি করে তবে সবাইকে বের করে দেব। এরপর আমাকে বলে আমার মা, স্ত্রী এবং বৌদিকে চিহ্নিত করতে। আমি তাদের সবাইকে সেখানে খুঁজে পাই। এরপর রাতে সেই লোকের বাড়ি থেকে সকালে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যাই। এর কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরে আসি। বাড়িতে এসে দেখি কিছুই নেই। তখন নতুন করে পুকুরের উত্তর পাড়ে বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করি।

পাশাপাশি দুই ঘাতক : পাকিস্তানি বাহিনীর জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে জামায়াত ইসলামীর নেতা আব্দুল কাদের মোল্লা। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য

ইন্দ্রমণি মালাকার (৬৮)

ইন্দ্রমণি মালাকার

পিতা: ঈশানরাম মালাকার, মাতা: রেনুদেবী মালাকার, গ্রাম: পাঁচগাঁও, ইউনিয়ন: পাঁচগাঁও, থানা: রাজনগর, জেলা: মৌলভীবাজার, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ জানুয়ারি ২০১৫

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা পাঁচগাঁও-এ প্রবেশ করে। গ্রামে প্রায় প্রতিদিন চুরি ডাকাতি হতো। তখন খুবই অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। হঠাৎ করে বাড়িতে প্রবেশ করে লুণ্ঠন করে সব কিছু নিয়ে যেতো। এই অবস্থার কারণে প্রতি ঘরের প্রায় সবাই জেগে থাকতো। প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে প্রতি রাতে গ্রামে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই অবস্থা চলাকালে ১৯৭১ সালের ৭ মে (বাংলা ৩০ বৈশাখ) ভোর ৩টার দিকে গ্রামে পাকিস্তানি আর্মির গাড়ি প্রবেশ করে। গাড়িতে প্রায় ৫০-৬০ জন সৈন্য ছিল। হঠাৎ করে গাড়ি দেখে গ্রামের লোকেরা কেউ বলে ডাকাত এসেছে, আবার কেউ বলে পাঞ্জাবি এসেছে। প্রতিটি রাস্তার মাথায় যারা পাহারায় ছিল তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে ভোর রাতে পাহারা শেষ করে বাড়ি ফিরে যায়।

শরণার্থী

কিন্তু তারা বাড়ি যাবার কিছুক্ষণ পরই পাকিস্তানি সৈন্যরা স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে ধরে একত্র করে। আমাদের বলা হয় ভয়ের কিছু নেই। শান্তির একটা মিটিং হবে। সবাই সেই মিটিং এ উপস্থিত থাকবে। একই কথা বলে তারা সবাইকে জড়ো করে। তারা নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলে তখন

আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। মাঝে মাঝে তারা হিন্দি ও উর্দুতেও কথা বলে। তখন তাদের কথা আমরা কিছুটা বুঝতে পারি।

একদল সৈন্য গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে লোক জড়ো করার কাজ করে। এই সময়ে নরেন্দ্র মালাকার নামে একজন পাকিস্তানি আর্মিকে ডাকাত মনে করে জড়িয়ে ধরে কুস্তি শুরু করে। কিন্তু এক পর্যায়ে সেই পাকিস্তানি সৈন্য হুইসেল বাজালে অন্য সৈন্যরা চলে আসে এবং তাকে আটক করে। অন্যদিকে আরেক দল শান্তিবাবুর বাড়িতে প্রবেশ করে। বাড়ির লোকেরা তাদের দেখে মনে করেছিলেন যে এরা ডাকাত। তাই মন্দিরের ঘন্টা বাজানো হয়। ঘণ্টার শব্দ শুনে অনেকে তাঁর বাড়িতে জড়ো হয়। যারা সেই বাড়িতে জড়ো হয় তাদেরও একত্রে দিঘির পাড়ে যেখানে বর্তমানে শহীদ মিনার হয়েছে সেখানে ধরে আনা হয়। অন্যদিকে পাহারা শেষ করে অনেকে একটি বাড়িতে জড়ো হয়েছিল তাদেরকে সেই বাড়ি থেকে ধরে আনা হয়। সবাইকে দিঘির পাড়ে একত্রে করে।

আমি ভয়ে একটি জঙ্গলে আশ্রয় নিই। হঠাৎ করে দেখি গ্রামের উত্তর মাথা থেকে বোম্বিং শুরু হয়। আমি জঙ্গলে বসে সব কিছু দেখছিলাম। কিন্তু আর্মির সামনে যাবার সাহস আমার ছিল না। বোম্বিং-এর সাথে সাথে দেখি সারা গ্রামে কালো ধুয়া ছড়িয়ে পড়েছে। এই বম্বিংটা করা হয়েছিল বিধুবাবুর [বিধু দেব। তারা ছিলেন কর্মকার] বাড়িতে। এই বাড়ি থেকে আগুন সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অন্যদিকে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকাররা হিন্দু অধ্যুষিত এই গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আগুন দেয়। এই সুযোগে গ্রামে শুরু হয় লুটপাট। প্রতিবেশি গ্রামের মানুষ পাঁচগাঁও থেকে মালপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়। যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে গেছে। কেউ নিয়েছে ঘরের টিন, কেউ নিয়েছে গরু-ছাগল, কেউ নিয়েছে ধান-চাল, কেউ নিয়েছে কাপড়, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস প্রভৃতি। চারদিকে তখন শুধু আগুন আর আগুন এবং তার মধ্যে আবার লুটপাট। কোনো জায়গার কোনো খবর তখন পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনতে পাই।

এই অবস্থা দেখে আমি ভয়ে দৌড়ে পাশের গ্রামে চলে যাই। আমি যাবার সময় পুকুরে লাশ ভেসে থাকতে দেখি। কয়েকটি লাশ আমি টেনে পুকুরের ঘাটে এনে রাখি। তখন ভয় কিছুটা কেটে যায়। মনে হয় মরলে মরবো, কিন্তু দেখে যাবো এরা জীবিত কি না। একজনকে

টেনে পুকুর ঘাটে নিয়ে আসি। সে আমার পূর্বের বাড়ির। নাম রঞ্জন মালাকার। তার গায়ে ছিল সেন্ডু গেঞ্জি ও লুঙ্গি। তাকে পুকুরের কিনারে রেখে আমি চলে যাই। সারমপুর নয়াবাড়িতে গিয়ে দেখি দুই জন লোক বসে আছেন। একজনের মাথায় গুলির ছিটা লেগেছে এবং অন্য জনের নাকের ডগা উড়ে গেছে। তারা দুজন রক্তাক্ত অবস্থায় বসে আছেন। তাদের মধ্যে একজনকে আমি মামা ডাকতাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম মামা কী হয়েছে? তিনি বললেন কেউ জীবিত নেই। সবাইকে ওরা মেরে ফেলেছে। আমাদের শরীরের কাপড় দিয়ে একজনের মাথার সাথে অন্যজনের পা বেঁধে পুকুরে ফেলে দেয়। সুবোধের কানের পাশে গুলি লেগেছে। আমি ওর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে এসেছি। বাঁধন খুলে দেবার পর ও পানিতে ডুবে গেছে। মনে হয় মারা গেছে। এই কথা শুনে প্রচণ্ড ভয় পাই। দুই পা এক করে দাঁড়াতে পারছিলাম না। ভোর থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। সারমপুরের সেই বাড়িতে আমাদের গ্রামের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিল। কেউ কেউ মহিলা নিয়েও আশ্রয় নেন।

সারমপুরের নয়াবাড়ির লোকেরা আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে। রহমত উল্লাহ নামে একজন আমাদের বলেন, আমরা তো এত লোকের কোনো উপকার করতে পারবো না। একটা বড় ডেগ, চাল ও আলু দিচ্ছি। আপনারা নিজেদের মতো রান্না করে কিছু খেয়ে নেন। আপনারা তো আমাদের ঘরে কিছু খাবেন না। তাই আমার উঠানে রান্না করে সবাই মিলে খেয়ে নেন। যে যেমন করে পারেন তেমনি সুবিধা করে খেয়ে নেন। অনেকে আবার না খেয়ে ছিলেন। কারণ তখন তাদের খাওয়ার প্রতি নজর ছিল না। অনেকের ছোট ছোট বাচ্চারা কান্নাকাটি করছিল। উঠানে বড় ডেগে সিদ্ধ ভাত রান্না করে খাওয়া হয়। এই বাড়ি থেকেই যে যে দিকে পেরেছে চলে গেছে।

গ্রামের অবস্থা তখন ছিল খুবই ভয়াবহ। চতুর্দিকে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে নিয়ে গেছে। আগুনে পুড়ে যা অবশিষ্ট ছিল তা আবার লুট করে নিয়ে গেছে। গরু, ছাগল, মহিষ যা ছিল তা সবই পরিষ্কার করে নিয়ে যায়। নয়াবাড়ির রহমত উল্লাহর ছোট ভাই কেরামত এই লুটপাটে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু একা তার পক্ষে কিছু করার ছিল না। সে ঘর থেকে একটা জাটা [এক প্রকার ধারালো দেশিয় অস্ত্র] নিয়ে লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণের চেষ্টা করে। সে বলে পাঁচগাঁও গ্রামের সব কিছু তোমরা পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছো। মানুষের এই দুঃসময়ে তোমরা কী শুরু করেছো? তখন তার

বড় ভাই তাকে বাধা দেন। তিনি বলেন যে, এখন কথা বলার সময় নয়। আমরা আওয়ামী লীগ করি। আমাদের শত্রুর অভাব নেই। তিন চার জন ধরে ছোট ভাইকে আটকান।

তাদের বাড়ির পাশে একটি মসজিদ ছিল। সেই মসজিদের এক লোক রহমত উল্লাহকে হুমকি দেয় যে তোমরা হিন্দুদের আশ্রয় দিয়েছো। পাকিস্তানি আর্মি এনে তোমাদের ধরিয়ে দেব। তখন তাদের বাড়ির এক লোক বলেন, ভাই যখন আনবে তখন নিয়ে আসো। কিন্তু এখন এতগুলো অসহায় মানুষকে আশ্রয় দেয়া প্রয়োজন। যদি তাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে আমরা মারা যাই তবে মারা যাব। এখন তাদের আশ্রয় দেয়া প্রয়োজন।

এরপর আমি সারমপুরের নয়াবাড়ি থেকে আমার বোনের বাড়ি চলে যাই। যাবার সময় রাস্তায় রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখি। দুই দিন পর বাড়ি ফিরে আসি। তখন দেখি পুকুরে জাল ফেলে লাশ তোলা হয়েছে। সেই লাশগুলো পুকুরের পাশের খালে মাটিচাপা দেওয়া হয়।

শরণার্থী

অদ্বৈত মালাকার (৫৫)

পিতা: নারায়ণ মালাকার, মাতা: প্রবাসী মালাকার, গ্রাম: পাঁচগাঁও, ইউনিয়ন: পাঁচগাঁও, থানা: রাজনগর, জেলা: মৌলভীবাজার, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৪ জানুয়ারি ২০১৫

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন সারা দেশে গণহত্যা শুরু করে তখন আমাদের গ্রামেও তার প্রভাব পড়ে। আমাদের গ্রামটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। আশেপাশের প্রায় সব বাড়ির লোক ছিল হিন্দু। এখানে শব্দকর, মালাকার ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক ছিল বেশি। গ্রামে ঘন ঘন ডাকাতি এবং লুটপাট শুরু হয়। তখন গ্রামকে

অদ্বৈত মালাকার

ডাকাত ও লুটপাটকারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তবে পুলিশ বা আর্মি আমাদের গ্রামে আসবে তা সাধারণ মানুষ জানতো না। সাধারণ মানুষ মনে করেছিল যেহেতু তাদের গরু-বাছুর নিয়ে যাচ্ছে তাই পাহারা দিয়ে তা আটকানো সম্ভব। গ্রামের প্রতিটি রাস্তার মাথায় প্রতিটি পরিবারের একজন করে প্রতি রাতে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যেই একদিন ৭ মে রাজাকার আলাউদ্দিন পাকিস্তানি আর্মিদের গ্রামে নিয়ে আসে। তার সাথে ছিল মদরিছ, পশ্চিমবাগের আব্বাস, রশিদ উল্লাহ প্রমুখ।

সেদিন ভোরে অনেকে পাহারা শেষ করে বাড়িতে এসেছেন। অনেকে আবার এক সাথে বসে গল্প করছিলেন। কেউ কেউ আবার লাঙল-জোয়াল নিয়ে জমিতে চাষে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই সময়ে আবার গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। পাকিস্তানিরা গ্রামে প্রবেশ করে শান্তির মিটিং আছে বলে আশেপাশের বাড়ির সবাইকে একত্র করে। আমাদের বাড়িতে এসে আমার বাবা ও কাকাদের ওদের সাথে যেতে বলে। আমিও তাদের সাথে যেতে চাই। কিন্তু আমাকে নিয়ে যায়নি। প্রতিবেশীরা আমাকে যেতে নিষেধ করে। তারা আমাকে বলে যে তুই গেলে ওরা তোকে লাথি দিয়ে মেরে ফেলবে। তাই আমি আর যাইনি। ভয় পেয়ে একটি খালের মধ্যে লুকিয়ে থাকি। আমি জঙ্গলে লুকিয়ে দেখছিলাম যে তারা কি করে। আমার মা আমার নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করেন। কিন্তু আমি ভয়ে কোনো শব্দ করিনি।

চতুর্দিকে তখন শুধু আগুন আর আগুন। আমাদের গ্রামের সবাইকে পুকুর পাড়ে জড়ো করে পশ্চিমদিকে মুখ করে বসিয়ে রাখে। তখন চতুর্দিকে শুধু গুলির শব্দ আর মানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। তখন বুঝতে পারি যে আমরা কেউ আর বাঁচবো না এবং আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখি তারা গুলি করে সবাইকে পানিতে ফেলে দিচ্ছে। এর কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানি সৈন্যরা গাড়ি নিয়ে চলে যায়। সেখানে কোনো সাড়া শব্দ নেই। এরপর বাড়ির পূর্বদিকে বের হয়ে দেখি এক লোক সাদা কাপড় পড়ে আমাদের বাড়িতে আসে। আমি তাকে চিনতে পারিনি। তিনি ছিলেন রক্তাক্ত। আমি পুকুর পাড়ে যাই কি হয়েছে দেখার জন্য। পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখি লাশ আর লাশ। পুকুরের পানিতে এবং পুকুর পাড়ে লাশের ছড়াছড়ি। এত লাশ দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পাশের গ্রামের মানুষ আসে এখানে কী হয়েছে দেখার জন্য। তারা আমাকে ডেকে বাড়িতে বাড়িতে যেতে বলে। কিন্তু আমি ভয়ে আর বাড়িতে ফিরে আসিনি।

আমি এক দৌড়ে সারমপুর চলে যাই। যাবার সময় দেখি প্রতিবেশী গ্রামের মানুষরা আমাদের গ্রাম থেকে জিনিপত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। এর পর কয়েকদিন বাড়িতে আসিনি। কিছুদিন পর বাড়িতে আসি। বাড়িতে আসার পর দেখি আমার বাবা বাড়িতে ফিরে এসেছেন। তাকে যাতে কেউ চিনতে না পারে সেজন্য সেদিন তিনি মহিলাদের কাপড় পরে এসেছিলেন। তাই পাশ দিয়ে গেলেও তাকে দেখে আমি চিনতে পারিনি। আমার বাবার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমাদের গ্রামে একজন সরকারি ডাক্তার ছিলেন যার নাম সিদ্দেক মিয়া। তিনি নিজের পকেটের টাকা দিয়ে আমার বাবাকে ভালো ভালো ঔষধ কিনে দিয়েছেন। বাবার সাথে অন্য একজন জীবিত ফিরে আসেন যার নাম সুবোধ। তিনিও আমাদের বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন। বাবা ৫-৬ বছর পর মারা যান।

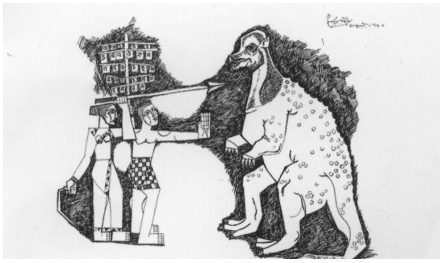

মুর্তজা বশীর
বাংলাদেশ ১৯৭১
কালি ও কলম, ১৯৭২

পরেশ দেবনাথ

পিতা: রমন দেবনাথ, মাতা: সরজীনী দেবনাথ, গ্রাম: পাঁচগাঁও, ইউনিয়ন: পাঁচগাঁও, থানা: রাজনগর, জেলা: মৌলভীবাজার, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৪ জানুয়ারি ২০১৫

আমাদের গ্রামে অনেকের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে যে গ্রামে পাঞ্জাবি আসবে। দুই বাড়িতে আবার ডাকাতিও হয়। এই জন্য গ্রামে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ৭ মে শেষ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের গ্রামে হামলা করে। পাকিস্তানিদের গাড়ি যখন রাজনগর আসে তখন আমরা অনেকে শব্দ শুনে বুঝতে পারি যে পাকিস্তানি সৈন্যরা এসেছে। অনেকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। আমি অনেককে পালিয়ে যেতে বলি। কিন্তু রাজাকারদের আশ্বাসে সবাই থেকে যান। সৈন্যরা হিরণ বাবুর বাড়িতে প্রবেশ করে লুটপাট চালায়। এর পর তারা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পরে। তাদের সাথে

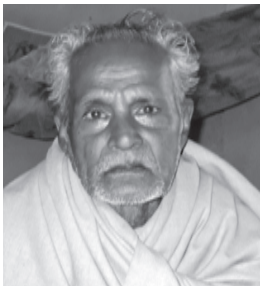

পরেশ দেবনাথ

যারা ছিল তাদের মধ্যে আলাউদ্দিন, গফুর মেম্বার, আব্বাস মেম্বার, বাছিত দেওয়ানের বাড়ির আত্তর মণ্ডল ছিল অন্যতম। রাজাকাররা সবাইকে বলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে সারেন্ডার করলে কারোও কোনো সমস্যা হবে। তা হলে তোমাদের আর মারবে না। এই বলে সবাইকে হিরণ বাবুর বাড়ির দিঘির পাড়ে জড়ো করে। সবাইকে উলঙ্গ করে একজনের পায়ের সাথে অন্যজনের মাথা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়। তারপর গুলি করে। গুলি করার পর কয়েকজন বেঁচে যান।

আমার দুই ভাইও পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। আমি পাশের গ্রামে ছিলাম। দুইদিন পর বাড়ি ফিরে আসি। আমি আমার মা ও এক ভাগ্নিকে নিয়ে বাড়িতে থাকি। আমাদের বাড়ির সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। একটি ঘর ছিল সেই ঘরেই আমরা থাকা শুরু করি। আমাদের আশেপাশের গ্রামের মানুষ আমাদের গ্রামে লুটপাট চালায়। আমার বাড়ি থেকে রাজাকাররা ৭০ মন ধান লুট করে নিয়ে যায়।

সোহান আখন্দ
বয়স ৬
গণহত্যা
জল রং, ১৯৮৭

মিহির কান্তি দাস মঞ্জু (৬০)

পিতা: মৃত মধুসূদন দাস, মাতা: বেলা রানী দাস, গ্রাম: নওয়াগাঁও, থানা: রাজনগর, জেলা: মৌলভীবাজার, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: পাঁচগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ৪ জানুয়ারি ২০১৫

১৯৭১ সালে আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবা ছিলেন চেয়ারম্যান। আমরা আগে থেকে শুনতে পাই যে পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামে হামলা করতে পারে। ডাকাতি ও লুটপাটের ভয়ে গ্রামের মানুষ গ্রামে পাহারার ব্যবস্থা করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের ইউনিয়নে কয়েকটি পর্যায়ে গণহত্যা সংঘটিত করে। অনেককে গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে অন্য স্থানে হত্যা

মিহির কান্তি দাস মঞ্জু

করা হয়। তাদের সম্পর্কে আমরা আর কোনো তথ্য জানতে পারিনি। তবে ১৯৭১ সালের ৭ মে সবচেয়ে বড় গণহত্যা সংঘটিত হয়। সেদিন রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা আলাউদ্দিন রাজাকারের বাড়িতে আসে। এরপর ভোর রাতে সৈন্যরা আলাউদ্দিনসহ স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় হিন্দু অধ্যুষিত পাঁচগাঁও গ্রামে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও ডাকাতের ভয়ে গ্রামের মানুষ পাহারা দিয়ে বাড়িতে যায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য। সেই সময়ে ভোর রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে তাণ্ডব চালায়। বলা হয় যে শান্তি কমিটির মিটিং আছে এবং সেই মিটিং-এ সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাদের কথা মতো গ্রামের নিরীহ মানুষ হিরণ বাবুর দিঘির পাড়ে সমবেত হয়। এরপর তাদেরকে ২-৩ জন করে একত্রে বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়া হয়। পানিতে ফেলার পর শুরু হয় নির্বিচারে গুলি। পুকুরের পানি রক্তে লাল হয়ে যায়। সেদিনের সেই ভয়াবহ অবস্থা থেকে ৩-৪ জন জীবিত ফিরতে পারেন। তাদের মধ্যে বর্তমানে সুবোধ ও সুখ জীবিত আছেন। বাকিরা মারা যান। সেদিন গ্রাম থেকে আর ৭ জনকে ধরে নিয়ে মৌলভীবাজার চাঁদনীঘাট ব্রিজের উপর হত্যা করা হয়। এরপর পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগী রাজাকাররা সারা গ্রামে লুটপাট চালায়। আশেপাশের গ্রাম থেকে মানুষ এসে পাঁচগাঁও গ্রামে লুটপাট চালায়। এবং প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য সরকারিভাবে কোনো কিছুই করা হয়নি।

বীরাঙ্গনার মৌখিক ভাষ্য

প্রবাসী মালাকার (৯২)

পিতা: রাজারাম মালাকার, মাতা: প্রসন্ন মালাকার, স্বামী: নারায়ণ মালাকার, গ্রাম: পাঁচগাঁও, ইউনিয়ন: পাঁচগাঁও, থানা: রাজনগর, জেলা: মৌলভীবাজার, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৪ জানুয়ারি ২০১৫

আমার ২ ছেলে ২ মেয়ে। ১৯৭১ সালে আমার পরিবারের ৩ জন শহীদ হয়েছে। আমার স্বামী নারায়ণ মালাকার এবং আমার দুই দেবর লঙ্গু মালাকার ও বিধু মালাকার। পাকিস্তানি বাহিনী ও ডাকাতের ভয়ে আমাদের গ্রামে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের গ্রামে হিরণ বাবু

নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি গ্রামের সবাইকে ডেকে বলেন, গ্রামকে রক্ষা করার জন্য পাহারা দেয়া প্রয়োজন। পাহারা দিলে চোর-ডাকাত গ্রামে আসতে পারবে না। কারণ কয়েকবার গ্রামে ডাকাতি হয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানি সৈন্য গ্রামে হামলা করতে পারে বলে সবাই চিন্তায় থাকতো। গ্রামের লোকেরা মরহম চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করে যে পাকিস্তানি বাহিনী আসলে তাদের কোনো সমস্যা হবে কি না? তিনি বলেন তোমরা কৃষক মজুর মানুষ, তোমাদের পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছু করবে না। আমরা চেয়ারম্যানের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। তারপরও গ্রামের নিরাপত্তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। এবং প্রতি পরিবার থেকে একজন করে পালাক্রমে প্রতি রাতে পাহারা দিতেন। সেদিন রাতেও সবাই পাহারায় যান।

প্রবাসী মালাকার

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৭ মে শুক্রবার। ভোরে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের গ্রামে হামলা চালায়। অনেকে সেদিন রাতে পাহারা থেকে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে পাকিস্তানি সৈন্যরা সাথে স্থানীয় রাজাকার আলাউদ্দিন, আব্বাস মেম্বার, মদরিছ মিয়া, ওয়াব উল্লাহসহ অনেকে। আমাদের বাড়ির সবাইকে বলে শান্তির মিটিং আছে তাই যেতে হবে। তাদের শিখিয়ে দেয় তারা যাতে প্রতিবেশীদেরও তাদের সাথে যেতে বলেন। আমার স্বামী ও দেবররা আশেপাশের বাড়ির অকেককে ডেকে তাদের সাথে নিয়ে যায়। আমাদের বলে তোমরা চিন্তা করো না। ওরা ফিরে আসবে। এরপর রাজাকাররা আমার ৭টি ঘরে আগুন দেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের বাড়িতে আগুন দিয়ে চলে যাবার পর এই রাজাকাররা আমাদের নির্যাতন করে। চারদিকে আগুন দিয়ে ঘরের ভিতরে মহিলাদের উপর অত্যাচার [ধর্ষণ] করে। আমি ও আমার দুই জা কে ওরা

Girls freed from Pakistani harems

লন্ডন থেকে প্রকাশিত মিরর পত্রিকায় পাকিস্তানি বাহিনীর নারী নির্যাতনের খবর

অত্যাচার করে। আমার এক জায়ের নাম ছিল শান্তি মালাকার এবং অন্যজনরে নাম বাসন্তি মালাকার। দুজনেই ছিল অল্প বয়সের।

আমার জা শান্তির একটা বাচ্চা এক মাস বয়সে মারা গেছে। তার উপর এই নির্যাতন করা হয়। আমার ছোট ছেলে আমার কোলে ছিল। আমার ছেলেকে আমার কোল থেকে নিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। ও বাইরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকে। রাজাকাররা আমি ও আমার জাদের উপর যে নির্যাতন করে তা বলার মতো না। রাজাকাররা ৪-৫ জন মিলে আমাদের উপর অত্যাচার করে। যারা নির্যাতন করে তাদের মধ্যে ছিল আলাউদ্দিন, আব্বাস মেম্বার, আকবর আলী, রশিদ উল্লাহ প্রমুখ। তাদের সাথে তারাপাশার এক রাজাকার ছিল। সে এখনও জীবিত আছে। কিন্তু তার নাম আমার এখন মনে নেই। সে আমাকে নির্যাতন করার সময় বলে তোমার স্বামীকে আমি নিজ হাতে বেঁধেছি। আমি অনেক যাতনা পেয়ে এই কাজ করেছি। আমি তাদের বলি তোমরা কেন আমাদের নির্যাতন করছো? আমার স্বামী আছে, সন্তান আছে। কিন্তু তারা আমার কথা শুনেনি। আমরা ঘরের বউরা সব সময় ঘরের ভিতরেই থাকতাম। তাই আমাদের বাইরের মানুষ খুব বেশি দেখেনি। কিন্তু যারা আমাদের নির্যাতন করে তারা সবাই ছিল আমাদের পরিচিত। তাদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আমার দুই জা অজ্ঞান হয়ে যায়। চেয়ারম্যান এসে তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। দুইদিন পর ওদের জ্ঞান ফিরে। ওদের নিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় যাই এবং চিকিৎসা করে সুস্থ করি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওদের দুজনকে আমরা অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিই। ওরা দুজনেই বর্তমানে মারা গেছে।

নির্যাতনের পর রাজাকাররা আমাদের বাড়ি লুট করে চলে যায়। আমরা তিন বউয়ের অনেক সোনার গহনা ছিল। সবই রাজাকাররা নিয়ে গেছে। আমার ঘরে ১৫০ মন ধান ছিল। আলাউদ্দিন রাজাকার দা নিয়ে এসে আমার ভারার কেটে সব চাল নিয়ে যায়। আমি বাধা দিলে আমাকে বলে চিন্তা করো না, তুমি আমার বোন। আমি আমার বাড়িতে নিয়ে রাখছি। না হলে তো সব লুট হয়ে যাবে। পরে আবার তোমাদের দিয়ে দিব। আমার চালের ভারারে আগুন লেগেছিল। তাই সেই চাল আর খাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। আমার ৩টা বড় ষাঁড় ছিল। সেগুলোও লুট করে নিয়ে যায়। আমার ঘরের দরজা পর্যন্ত ওরা খুলে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার সময় হঠাৎ করে পাশের বাড়ির এক মহিলা আমাকে একটু ঘর থেকে বের হতে বলে। আমি ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আমার স্বামী মহিলাদের একটি সাদা শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করেন। আমি তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করি তুমি এসেছো, তোমার দুই ভাই কোথায়? আমার প্রশ্ন শুনে সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর দাঁতে গুলি লেগে ৪টি দাঁতসহ মাড়ি ভেঙ্গে যায়। এরপর তাঁকে আমরা ৩ বছর বাড়ির বাইরে বের করিনি। এবং সব সময় লুকিয়ে রাখি যাতে রাজাকাররা তাকে না দেখতে পারে। এরপর জানতে পারি আমার দুই দেবকে ওরা মেরে ফেলেছে। এরপরও আমার বাড়িতে ওরা কয়েকবার এসেছিল। কিন্তু উনাকে খুঁজে পায়নি। ৫-৬ বছর পর তিনি মারা যান। আমি ভিক্ষা করে আমার সংসার চালিয়েছি। সরকার থেকে টিন ও টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা কিছুই পাইনি। হিন্দু ও মুসলমান বাড়ির পোড়া চাল ভিক্ষা করে এনে আমার সন্তান ও স্বামীর খাবার ব্যবস্থা করেছি। স্বাধীনতার পর অনেকবার আমার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং টিভিতেও আমাকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সাহায্য পাইনি। আমার জায়গা জমি দখল করে নিয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা। আমরা মামলা করে রায় পেয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই জায়গার দখল নিতে পারিনি। আর সেই জায়গা কখনো ফিরে পাবো কি না জানি না। তাই এইসব দুঃখের কথা আপনাকে বলে লাভ নেই। যে আলাউদ্দিন আমাদের উপর এত নির্যাতন করলো তার বংশধরেরা এখনও পর্যন্ত লীলা নাগের বাড়ি দখল করে আছে। কিন্তু সরকার কিছুই করেনি।

স্মৃতিরক্ষা ও সংরক্ষণের প্রয়াস

স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পর সরকারি কর্মকর্তাসহ তৎকালীন এমপি তোয়াবুর রহিম, আওয়ামী লীগ নেতা আজিজুর রহমান, ন্যাপ নেতা তারা মিয়া, রাজনীতিবিদ শশাঙ্ক শেখর ঘোষ প্রমুখ পাঁচগাঁও যান। তারা মাটি খুঁড়ে লাশ শনাক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে জননেতা মনি সিংহ, পীর হাবিবুর রহমান, বেগম মতিয়া চৌধুরী পাঁচগাঁও গণহত্যার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ১৯৮৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্থানীয়ভাবে চাঁদা তুলে শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে যথাযথ যত্ন ও প্রশাসনিক সাহায্যের অভাবে স্মৃতিসৌধটি বিলুপ্তির পথে। পাঁচগাঁও গ্রামের শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, শহীদদের নামফলক প্রতিষ্ঠা এবং শহীদদের নামে রাস্তার নামকরণসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এলাকাবাসী দাবি জানান।

স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়াস সম্পর্কে পাঁচগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মিহির কান্তি দাস মঞ্জু জানান, শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য ১৯৯৭ সালে গণকবর স্মৃতিফলক বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। সেই সময়ে মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার সাংসদ হুসনে আরা ওয়াহিদ ও মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমানকে এখানে এসে গণকবরের স্মৃতিফলকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সাংসদ স্মৃতিফলক তৈরির জন্য ৪টন গম দান করেন। এই গম দিয়ে গণকবরটির চারদিকে দেয়াল তৈরি করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর বর্তমান জেলা পরিষদ প্রশাসক আজিজুর রহমানকে প্রধান অতিথি করে অনুষ্ঠান করা হয়। তৎকালীন পাঁচগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই স্থান ছিল অন্যের দখলে। দখল মুক্ত করে গণকবর সংরক্ষণে এলাকাবাসীকে অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। ১৯৯৭ সালের ১৬ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দখলদারদের সাথে অনুষ্ঠান আয়োজকদের সমস্যা চরম আকার ধারণ করে। ১৫ ডিসেম্বর রাতে উপজেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দ গণকবর পাহারার ব্যবস্থা করেন যাতে পরের দিনের অনুষ্ঠানে কোনো সমস্যা না হয়।

এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। এই স্থান পরিদর্শনের জন্য সেক্টর কমান্ডার ফোরাম, মুক্তিযোদ্ধা উপজেলা সংসদ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ও বর্তমান সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসীন আলী কয়েকবার আসেন। ২০১২ সালে সৈয়দ মহসীন আলী সাংসদ থাকা অবস্থায় ঢাকা থেকে অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এসে জায়গা জরিপ করেন স্থানটিকে বধ্যভূমি ঘোষণার জন্য। এছাড়াও মৌলভীবাজারের তখনকার জেলা প্রশাসক মোস্তাফিজুর রহমান এবং বর্তমান জেলা প্রশাসক কামরুল ইসলামও কয়েকবার এই স্থানটি পরিদর্শন করেন। সবাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোর জন্য এই স্থানটিকে বধ্যভূমি হিসেবে ঘোষণার আশ্বাস দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি।

২০১১ সালে মিহির কান্তি দাস ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ার পর ২০১১-২০১২ অর্থবছরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ২ জন মেম্বরের মাধ্যমে সেই স্থানটির কিছু সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। সরকার থেকে কয়েকবার আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে এখানে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করে স্থানটিকে বধ্যভূমি ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে স্থানটিকে পরিস্কার করে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দিঘির পানি থেকে লাশ তুলে এখানে সমাহিত করা হয়

অন্যদিকে শহীদ পরিবারের সদস্যরা খুবই কষ্টে জীবনযাপন করছেন। পাঁচগাঁও ইউনিয়নে ৬৬টি শহীদ পরিবার আছে। তাদের পরিবারের কর্মক্ষম লোকগুলোকে হত্যা করা হয়েছে। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে তারা অসহায় জীবনযাপন করছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিএফের মাধ্যমে তাদের কিছু চাল [১০ কেজি] দিয়ে সাহায্য করা হয়। কিন্তু তা খুবই অল্প। এক জন বীরাঙ্গনা আছেন যাকে বয়স্কভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করা প্রয়োজন।

বর্তমান অবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের পর স্থানীয় জনগণ এই এলাকার শহীদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের দাবি জানান। স্বাধীনতার ৪৪ বছর অতিবাহিত হলেও শহীদদের গণকবরটি সংরক্ষণ করা হয়নি। ১৯৯১ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের একজন প্রার্থী ইসমাইল মিয়া শহীদদের গণকবরটি ৯৪′x ৯′ x ৩′ দেয়াল দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাদের গণকবরের সামনেই নির্মাণ করা হয় একটি স্মৃতিস্তম্ভ। ৯′′, ১৬′′, ১৯′′ উচ্চতাবিশিষ্ট ৩টি স্তরে। এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মিত হয়। স্মৃতিস্তম্ভটির দ্বিতীয় স্তরের গায়ে লেখা আছে 'শহীদ স্মরণে/১৯৭১ ইং এর গণহত্যা/পাঁচগাঁও।'

স্থানীয়ভাবে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ

মূল্যায়ন

১৯৭১ সালে সারা দেশে গণহত্যা শুরু হলে এর প্রভাব রাজনগর উপজেলাতেও পড়ে। রাজনগর উপজেলায় যতগুলো গণহত্যা হয়েছে তার মধ্যে পাঁচগাঁও গণহত্যা অন্যতম। এই গণহত্যার মূল পরিকল্পনাকারী রাজাকার আলাউদ্দিন চৌধুরী। তিনি এবং তার সহযোগীরা হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ধনসম্পদ লুট করার জন্য পাকিস্তানিদের গ্রামে নিয়ে আসে। ৭ মে যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামে হামলা চালায় তখন তাদের সাথে ছিল স্থানীয় রাজাকাররা। রাজাকাররা পাকিস্তানি সৈন্যদের বাড়ি দেখিয়ে নিয়ে যায়। গ্রামের সাধারণ মানুষকে ডাকাতির হাত থেকে রক্ষার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করেও কোনো লাভ হয়নি। সে রাজাকাররা কয়েকদিন আগেও নারায়ণ মালাকারের বাড়িতে আসা যাওয়া করেছে সেই আবার ঐ বাড়ির বউদের ধর্ষণ করেছে।

গ্রামের প্রায় শতাধিক নিরীহ মানুষকে হিরণ বাবুর দিঘির পাড়ে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। শুধু গুলি নয়, তাদের হাত পা বেঁধে গুলি করা হয়। গ্রাম থেকে অনেককে ধরে গ্রামের বাইরে নিয়ে হত্যা করে। এবং যুদ্ধের নয় মাসে কয়েকশ লোককে হত্যা করে।

পাঁচগাঁও গণহত্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন গ্রামের মানুষ এই গণহত্যা সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং বলা হয়েছিল শান্তি বাবুর বাড়ির মন্দিরের ঘন্টা বাজনো হলে সবাই যাতে একত্র হয়। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমলে এসেও আমরা দেখি বিভিন্ন আন্দোলনের সময় ঘণ্টা বাজিয়ে একত্র হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলের কৃষক বিদ্রোহের কথা বলা যায়। এছাড়াও দিঘির পাড়ে জড়ো করে একজনের মাথার সাথে অন্যজনের পা বেঁধে পানিতে নিক্ষেপ করে সলিল সমাধি এবং একই সঙ্গে গুলি। পাকিস্তানি হানাদারদের ভয়ে ভীত না হয়ে এলাকাবাসী দিঘিতে জাল ফেলে লাশগুলো তুলে আনে এবং গণকবর দেয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে পাশের গ্রামের মানুষ পাঁচগাঁও-এর আশ্রয়হীন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের আশ্রয়, খাবার ও পরার জন্য কাপড় দিয়েছেন। রাজাকারদের হুমকির মুখে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও তারা বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করেছেন। এই গণহত্যার মূল উদ্দেশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তির প্রতি লোভ।

স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও পাঁচগাঁও গণহত্যার গণকবর সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষনের সরকারি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সে আলাউদ্দিন রাজাকার পাঁওগাঁও গণহত্যা সংঘটনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে সে দখল করে আছে লীলা নাগের পৈতৃক বাড়ি। লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিকন্যা। আলাউদ্দিন রাজাকার মারা গেলেও তার বংশধরেরা সেই বাড়ি দখল করে আছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কার্যকর করা হচ্ছে না। যদি হতো তাহলে পাঁচগাঁওয়ের সেই কুখ্যাত রাজাকার লীলা নাগের বাড়ি দখল করে থাকতে পারতো না। এই সব রাজাকারদের সামাজিকভাবে বয়কট করে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো প্রয়োজন। স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা এবং সরকারিভাবে গণকবর ঘোষণার মধ্য দিয়ে বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করলে শহীদদের আত্মাকে কিছুটা হলেও শান্তি দেওয়া সম্ভব হবে। শহীদ পরিবারের প্রত্যাশা এতটুকুই।

পরিশিষ্ট

একাত্তরে পাঁচগাঁও গ্রামের গণহত্যা

রাধিকা মোহন গোস্বামী

মৌলভীবাজার জেলার নিভৃত পল্লী পাঁচগাঁও গ্রাম। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গ্রামে সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী তখন সর্বত্রই গণহত্যা নির্যাতন চালিয়েছিল। কিন্তু পাঁচগাঁও গ্রামের বর্বরতা ও পাশবিকতার সে দিনের কাহিনী সভ্যতা-ভব্যতাকে ম্লান করে দেয়। এই গণহত্যা এমন হৃদয়বিদারক ছিল যা ইতিহাস বিখ্যাত জালিওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বর্বরতাকেও ম্লান করে দেয়। দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর থানা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত পাঁচগাঁও গ্রামে তখনও যুদ্ধের ডামাডোল পৌঁছেনি। গ্রামের মুখচেনা কিছু কুচক্রী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তি থানা সদরে গিয়ে রাজাকার বাহিনীতে নাম লিখিয়ে আসে। এসব রাজাকার গ্রামের সাধারণ নিরীহ অধিবাসীদের ভয়ভীতি দেখাতে থাকে, গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার জন্যে উত্ত্যক্ত করতে থাকে। তখন রাজনগর থানার ওসি মতিউর রহমান পাঁচগাঁও গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন সময় গ্রামবাসীদের অভয়বানী শোনান। ওসি মতিউর সর্বশেষ ২৫ মার্চ পাঁচগাঁও গ্রামে গিয়ে আশ্বস্ত করেন। অথচ এর দুদিন পরই সংঘটিত হয় গণহত্যা।

"৭ মে, ১৯৭১। কাকডাকা ভোরে পাকিস্তানি সেনাবহিনীর অন্তত ৫০ জন দুটি গাড়িতে বোঝাই হয়ে পাঁচগাঁওয়ে পৌঁছে। গ্রামবাসীরা তখনো গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গ্রামের দালাল-রাজাকাররা গ্রামবাসীদের উঠিয়ে

গ্রামের হরিশংকর উকিলের বাড়ির সামনের দীঘির পাড়ে জমায়েত হতে বলে। সহজ সরল নিরীহ গ্রামবাসীরা দীঘির পাড়ে জমায়েত হতে শুরু করে। পাকিস্তানি নরপশুদের নির্দেশমতো স্থানীয় দালালরা দীঘির পাড়ে সমবেত লোকদের দড়ি দিয়ে বাঁধতে থাকে। একজনের পায়ের সঙ্গে অন্যজনেরর মাথা শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়। এভাবে ৭০জন গ্রামবাসীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জোড়া জোড়া করে দীঘির অথৈ পানিতে ফেলতে থাকে।"

শরীর বাঁধা অবস্থায় দীঘির পানিতে পড়ে লোকজন যখন হাবুডুবু খাচ্ছে এবং আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে তখন পাকসেনারা এসব অসহায় মানুষের ওপর মধ্যযুগীয় বর্বরতায় গুলি চালাতে থাকে। ওইদিন দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ৭০ জনের মধ্যে ৫৯ জন লোক মৃত্যুবরণ করে, যাদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন। দীঘির পাড়ে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ যখন চলছিল তখন গ্রামে বেঁচে যাওয়া লোকজন পালাতে থাকে। আর রাজাকাররা পাকবাহিনীল সমর্থনে গ্রামের বাড়িঘর লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দিতে থাকে। এভাবে ৭ মে একদিনেই পাঁচগাঁও গ্রাম তছনছ হয়ে যায়। রক্তের নদী প্রবাহিত করে পাকবাহিনী গ্রাম ত্যাগ করলে গ্রামবাসীরা দীঘিতে জাল ফেলে লাশ উদ্ধার করে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজও পাঁচগাঁও গ্রামবাসী একাত্তরের ৭ মের ঘটনা ভুলতে পারেনি। বাসসের মৌলভীবাজার প্রতিনিধি কিছুদিন আগে পাঁচগাঁও গ্রামে গেলে দেখতে পান গ্রামবাসীদের অনেকেই এখনো ডুকরে কেঁদে ওঠেন– এতো মৃত্যু, এতো ধ্বংস, এতো বিভীষিকা, এতো পাষণ্ডতা বলেও শেষ করা যায় না। গ্রামবাসীরা জানান, গ্রামের কুখ্যাত হারিছ উল্যা ও আলাউদ্দীন চৌধুরী তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পাকবাহিনীকে গ্রামে ডেকে নিয়ে আসে। হত্যাকাণ্ডের আগের দিন অর্থাৎ ৬ মে থেকে পাঁচগাঁও গ্রামের অবস্থা গুমট হয়ে পড়ে। হারিছ-আলাউদ্দীনদের চালচলনে রহস্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু গ্রামবাসীরা কল্পনাও করেনি হারিছ-আলাউদ্দীন প্রমুখ রাজাকাররা এতো নির্মম হতে পারে। তাদের ধারণা ছিল রাজাকারাও মানুষ। তাছাড়া সর্বশেষ ৫ মে ওসির অভয়বাণী গ্রামবাসীদের মানসিক অবস্থাকে চাঙ্গা রেখেছিল। গ্রামবাসীরা জানান, রাজাকার হারিছ এবং আলাউদ্দিনের নির্দেশ তাদের চামচারা ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষজনকে দিঘির পাড়ে সমবেত হতে বলে। আওর মণ্ডল, মদরিছ মিয়া, প্রমুখ রাজাকাররা সমবেত গ্রামবাসীকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে থাকে। সবকিছুই পাকবাহিনী তত্ত্বাবধানে করেছিল। বাসস প্রতিনিধির কাছে গ্রামবাসীদের বক্তব্য পাঁচগাঁও গ্রাম তো পাক হানাদারদের চিনবার কথা নয়, রাজাকাররাই নিয়ে এসেছি। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এসব নরপিশাচদের বিচার হয়নি। বর্তমানে এদের অনেকেই মারা গেছে। জীবিতও রয়েছে কেউ কেউ।

একাত্তরের ৭ মে পাঁচগাঁওয়ে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৪ জনের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বাকি ৫৬ জনের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এরা হলেন- ১. বসন্ত নমশূদ্র, ২. পরেশ নমশূদ্র, ৩. শ্যাম সুন্দর শব্দকর, ৪. পিয়ারী নমশূদ্র, ৫. গোপাল শব্দকর, ৬. নরী মালাকার, ৭. কুমার মালাকার, ৮. পুতুল অধিকারী, ৯. ব্রজেন্দ্র শব্দকর, ১০. মনাই শব্দকর, ১১. নগরী শব্দকর, ১২. বীরেশ শব্দকর, ১৩. রমন শব্দকর, ১৪. উপাই শব্দকর, ১৫. নিত্যবালা শব্দকর, ১৬. পরেশ শব্দকর, ১৭. নিরোদ শব্দকর, ১৮. মুকেশ মালাকার, ১৯. আদাই মালাকার, ২০. নবরাম শব্দকর, ২১. সোররাম শব্দকর, ২২. অভিরাম শব্দকর, ২৩. সতীশ মালাকার, ২৪. নান্টু বৈষ্ণব, ২৫. পরশ মালাকার, ২৬. ভগাই মালাকার, ২৭. কাউকা মালাকার, ২৮. বাদল মালাকার, ২৯. যতীন্দ্র নমশূদ্র, ৩০. রমন মালাকার, ৩১. নরেশ শব্দকর, ৩২. ইরেশ মালাকার, ৩৩. অভয় চরণ

দে, ৩৪. বিধূ মালাকার, ৩৫. সুবল মালাকার, ৩৬. নরেশ শব্দকর, ৩৭. রজনী কান্ত দে (শিক্ষক), ৩৮. নাগ নমশূদ্র, ৩৯. নগেন্দ্র দেব, ৪০. নগাই মালাকার, ৪১. সুরেন্দ্র মালাকার, ৪২. লুলু মালাকার, ৪৩. বীরেশ শব্দকর, ৪৪. রমনী দেব, ৪৫. কৃষ্ণ ঠাকুর, ৪৬. নরেশ নাথ, ৪৭. হরেন্দ্র শব্দকর, ৪৮. সতু মালাকার, ৪৯. আমিনী মালাকার, ৫০. লংগু মালাকার, ৫১. ললিত দাশ, ৫২. রবি মালাকার, ৫৩. রস মালাকার, ৫৪. সারো শব্দকর, ৫৫. ঠাকুর চাঁদ নমশূদ্র।

হরিশংকর উকিলের বাড়ির সামনে দিঘির পাড়ে এই নারকীয় গণহত্যার পর গ্রামে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পাক হানাদাররা এ সময় আরো ১৪ জন গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এদেরও গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু কারো লাশই ফেরত পাওয়া যায়নি। এই হতভাগ্য ১৪ জনের মধ্যে ১০ জনের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এরা হলেন– নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, রসময় চক্রবর্তী, খোকা ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য, বিনোদ চক্রবর্তী, হিরন্ময় দাশ, মাখন দাশ, রজনী দেব এবং ছটই চৌকিদার।

পাঁচগাঁও গ্রামের দিঘির পারে গণহত্যার শহীদদের গণকবরে সমাহিত করা হয় যার স্মৃতি এখনো রয়েছে। [বাসস ফিচার]

সূত্র: দৈনিক মাতৃভূমি, ২৫ মার্চ ২০০০

তথ্যপঞ্জি

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ২য় খণ্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

আশফাক হোসেন, *মৌলভীবাজারে মুক্তিযুদ্ধ*, মিরাজ প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯৭

তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটে গণহত্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৯

তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪

তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মারক*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭

সঞ্জয় কান্তি দেব, *বিস্মৃতির আড়ালে সিলেটের গণহত্যা*, শিবানী-মাধুরী কল্যাণ ট্রাস্ট, সিলেট, ২০১৪

সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

অপূর্ব শর্মা, *বীরাঙ্গনা কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

মুমিনুল হক, *রাজনগরের ইতিবৃত্ত*, অংকন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

স্মরণিকা, পাঁচগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের তেইশ বছরপূর্তি, ২০০৮

দৈনিক যুগান্তর, ২৮ মার্চ ২০০১

সুকেশ চন্দ্র দেব, '১৯৭১ সালে পাঁচগাঁওয়ে হত্যা করা হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোককে', *দৈনিক মাতৃভূমি*, ১২ মে ২০০০

রাধিকা মোহন গোস্বামী, 'একাত্তরে পাঁচগাঁও গ্রামের গণহত্যা', *দৈনিক মাতৃভূমি*, ২৫ মার্চ ২০০০

প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর ২০০৭

দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ মার্চ ২০০৬

সাক্ষাৎকার

সুবোধ মালাকার (৮২), পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার, ৩ জানুয়ারি ২০১৫
সুখময় শব্দকর (৬৫), ভূমিউড়া, রাজনগর, মৌলভীবাজার, ৪ জানুয়ারি ২০১৫
ইন্দ্রমণি মালাকার (৬৮), পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার, ৩ জানুয়ারি ২০১৫
অদ্বৈত্য মালাকার (৫৫), পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার, ৪ জানুয়ারি ২০১৫
পরেশ দেবনাথ, (৬৫), পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার, ৪ জানুয়ারি ২০১৫
মিহির কান্তি দাস মঞ্জু (৬০), নওয়াগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার, ৪ জানুয়ারি ২০১৫
প্রবাসী মালাকার (৯২), পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার, ৪ জানুয়ারি ২০১৫

ঋণস্বীকার

পার্থ সারথী কর, সাবিয়া, মৌলভীবাজার
রাজীব কুমার মণ্ডল, গবেষণা সহকারি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা
নিপুল দাস, শিক্ষক, বৃন্দাবনপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
উত্তম পালিত, সচিব, কনকপুর ইউনিয়ন পরিষদ, মৌলভীবাজার
রিচার্ড দত্ত, মাস্টার্স অধ্যয়নরত, আইন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্বাবদ্যালয়
জসীম আহমদ চৌধুরী, মৌলভীবাজার পৌরসভা, মৌলভীবাজার
তোফায়েল আহমদ, শিক্ষক, পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার
গৌরিপদ মালাকার, শিক্ষক, পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার
জ্যোতির্ময় দেব, শিক্ষক, পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার
সৌরভ মালাকার, ছাত্র, পাঁচগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার
বিকাশ মালাকার, ছাত্র, পাঁচগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার